ইসলামের বাস্তব কাহিনী-৫

আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর (রহঃ)
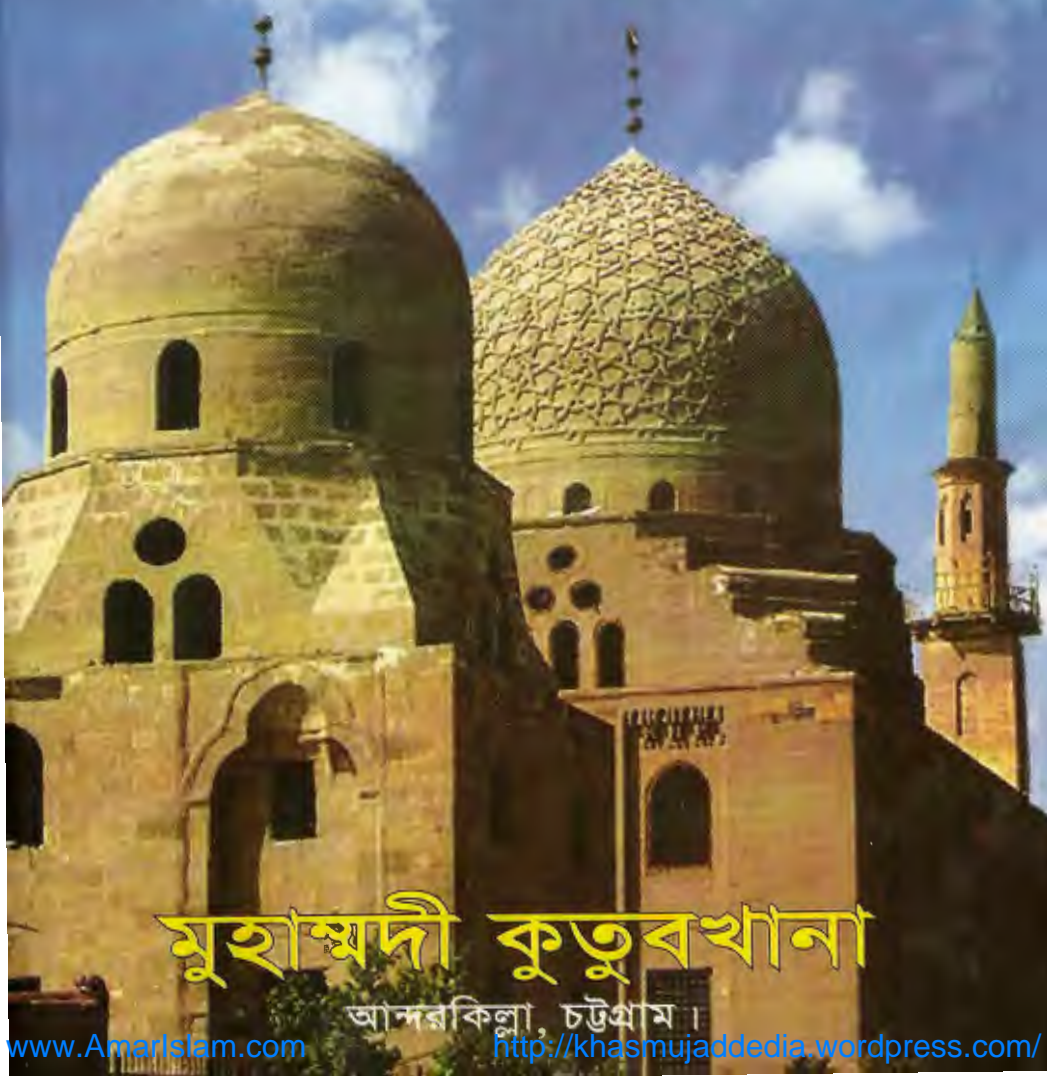
মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

(৫ম খণ্ড)

মূল- হযরত আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর
(রহমতুল্লাহে আলাইহে)
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন- ৬১৮৮৭৪
মোবাইল- ০১৮৯-৬২১৫১৪

প্রকাশনায় ঃ
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ
১৫ অক্টোবর ২০০৫ইং
● পূন:- মুদ্রন ২৪/১১/২০০৭

হাদিয়া ঃ ৮৫ টাকা

মুদ্রণে ঃ
এনামস প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সূচী

ইসলামের বাস্তব কাহিনী- ৫

কাহিনী নং- ৫৪২

সওয়ারী ঘোড়া

হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন খলীফা মনোনিত হন, তখন ঘোড়াশালার তত্ত্বাবধায়ক তাঁর জন্য একটি বিশেষ ঘোড়া আনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- "এটা কেন?" বলা হলো যে এটা খলীফার জন্য বিশেষ সওয়ারী ঘোড়া। তিনি বললেন, এটা আমার প্রয়োজন নেই। আমার নিজস্ব যে খচ্চর আছে, সেটা আন। আমি এ বিশেষ ঘোড়ায় আরোহন করবো না। (তারীখুল খোলাফা-১২০ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহ আনহু) একান্ত খোদাভীরু, ন্যায় পরায়ন ও প্রজা হিতৈষী খলীফা ছিলেন। তাঁর এ কাহিনী থেকে আমাদের এ শিক্ষা লাভ করা দরকার যে মানুষ কোন উচ্চস্থান লাভ করলেও যেন স্বীয় আগের অবস্থার কথা ভুলে না যায়।

কাহিনী নং- ৫৪৩

অধিক মূল্যবান গহনা

হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজের স্ত্রীর কাছে এক সেট খুবই মূল্যবান গহনা ছিল, যেটা ওনার পিতা আব্দুল মালেক ওনাকে দিয়েছিলেন। এক দিন হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর স্ত্রীকে বললেন- তুমি তোমার মূল্যবান গহনাগুলো সরকারী কোষাগারে দিয়ে দাও অথবা আমাকে অপছন্দ কর, যাতে আমি তোমাকে আলাদা করে দিতে পারি। কেননা আমি এটা চাই না যে আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরে তোমার এ গহনা থাকুক। তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনার জন্য আমি যাবতীয় গহনা ত্যাগ করতে রাজি আছি। আপনি আমার গহনাগুলো সরকারী কোষাগারে জমা করে দিন। হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজের ইন্তেকালের পর যখন ইয়াজিদ বিন আবদুর মালেক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি হযরত ওমরের

সম্মানিত স্ত্রীকে বলেন- আপনি চাইলে আমি আপনার গহনাগুলো ফেরত দিতে রাজি আছি। তিনি উত্তরে বলেন, যে জিনিসগুলো আমি স্বেচ্ছায় ওনার জীবদ্দশায় দিয়ে দিয়েছি, সেটা ওনার ইন্তেকালের পর ফেরত নেব না। (তারীখুল খোলাফা- ১২২ পৃঃ)

সবক ঃ খোদাভীরু শাসক দুনিয়াবী ধন সম্পদের প্রতি কখনো লালায়িত নয়। তারা সবসময় প্রজাদের কল্যানের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। যারা সরকারী সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে, তাদের পরিনতি খুবই খারাপ।

কাহিনী নং- ৫৪৪

নেকড়ে বাঘ ও ছাগল

হযরত হাসন কাসাব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার এমন এক ঘটনা দেখলেন যে নেকড়ে বাঘ ও ছাগলের পাল এক সাথে বিচরন করছে। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি বলে উঠলেন- 'সুবহানাল্লা! ছাগলের পাশেই নেকড়ে বাঘ! অথচ ছাগলের উপর কোন আক্রমন করছে না। বড় আশ্চর্যের বিষয়'। ওনার এ কথা শুনে সেই ছাগল গুলোর দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত রাখাল বললো- اذا صلح الراس فليس على الجسد باس মাথা ঠিক থাকলে শরীরের কোন ক্ষতি হয়না। অর্থাৎ আমাদের শাসক নেককার ও ন্যায়পরায়ন। এ জন্য প্রজারাও শান্তি ও নিরাপদে আছে। (তারীখুল খোলাফা- ১৬২ পৃঃ)

কাহিনী নং- ৫৪৫

রাজ্যের শাসনভার

হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন খলিফা নিয়োজিত হলেন, তখন তিনি ঘরে গিয়ে জায়নামাযে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মুবারক ভিজে গেছে। তাঁর স্ত্রী এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন- আমার কাঁধের উপর উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বোঝা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আমার প্রজাদের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক ইত্যাদির

ব্যাপারে চিন্তা করতেছি এবং ভয় করতেছি যে যদি আমার দায়িত্বে কোন অবহেলা হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব এবং আমার কি পরিনতি হবে? এ ভয়েই আমি কাঁদতেছি। (তারীখুল খোলাফা- ১৬৪ পৃঃ)

সবক ঃ রাজত্ব এক বিরাট বোঝা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। খোদাভীরু শাসক রাজত্ব পাওয়ার পরও খোদাকে ভুলে যান না। বরং কোন ভুল ত্রুটির ব্যাপারে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন এবং প্রজাদের প্রতিটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

কাহিনী নং- ৫৪৬

নিজের কাজ নিজে

রেজা বিন হায়াত বর্ণনা করেন- আমি কোন এক কাজে এক রাত্রে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর খাদেম পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তৈল শেষ হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ চেরাগটা নিভে যায়। আমি তাড়াতাড়ি খাদেমকে জাগিয়ে দিতে চাইলাম যেন চেরাগটা জ্বালিয়ে আনে। কিন্তু তিনি আমাকে বারণ করে বললেন, কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজে জ্বালিয়ে আনতে চাইলে আমাকেও বাঁধা দেন বরং বলেন- মেহমান দ্বারা কাজ করানো শিষ্টাচারের বরখেলাপ, আমি নিজেই জ্বালিয়ে আনতেছি। অতঃপর তিনি নিজে গিয়ে চেরাগে তৈল ভরে জ্বালিয়ে আনলেন এবং বললেন, আমি নিজেই চেরাগ জ্বালিয়ে আনলাম। এবং সেই ওমর বিন আবদুল আজিজই আছি, যা আগে ছিলাম। (তারীখুল খোলাফা- ১৬৬ পৃঃ)

সবক ঃ আগের যুগের নেককার লোকেরা অনেক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও নিজের কাজ নিজেই করতেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন বলে নিঃষ্কর্মা হয়ে যেতেন না। আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি কূলের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্বেও নিজের কাজ নিজে করতেন। আমাদেরও উচিৎ যেন নিজের কাজ নিজে করি। সব কাজের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

কাহিনী নং- ৫৪৭

গল্প

হযরত খালিদ বিন সিফওয়ান একদিন খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালেকের শাহী মহলে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন। খলিফা হিশাম ওনার কাছে কোন একটি গল্প শুনতে চাইলে তিনি নিম্নের গল্পটি বললেন ঃ

এক মান্যবর জ্ঞানী বাদশাহ খোরিক অঞ্চলে ভ্রমনে বের হলেন। যাত্রা পথে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সাথীদের কাছে জানতে চাইলেন যে ওনার কাছে যে পরিমান ধন-সম্পদ আছে, সে পরিমান অন্য কোন বাদশাহের কাছে কখনো ছিল কিনা? বাদশাহের সাথে এক বৃদ্ধ লোকও ছিল : সে বললো অনুমতি পেলে আমি এর জবাব দিতে আগ্রহী। বাদশাহ বললেন, খুবই ভাল কথা, তুমি জবাব দাও। বৃদ্ধ লোকটি বললো, প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার কাছে যা কিছু আছে, সেটা কি কখনো হ্রাস পাবে না? আপনার এ সব সম্পদ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন নি? আপনার পর এ ধনসম্পদ কি আপনার আপনজনেরা উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে না? বাদশাহ বললেন- এ প্রশ্ন তিনটির উত্তর হ্যা সূচক। তখন বৃদ্ধ লোকটি বললো- বড় আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি এমন জিনিস নিয়ে গর্ব করছেন, যেটা পরিবর্তনশীল, যার অধিকাংশ অন্যদের কাছে হস্তান্তর হয়ে যাবে এবং যা কিছু আপনি খরচ করেছেন, এর হিসেব দিতে হবে। বাদশাহ এ কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং বললেন, কি করি এবং কোথায় পালিয়ে যাব? বৃদ্ধ লোকটি বললো- যদি বাদশাহী করতে চান, তাহলে প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর আনুগত্য করুন। অন্যথায় এ সিংহাসন ও এ রাজমুকুট ত্যাগ করে মামুলি পোষাক পরে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী করুন। বাদশাহ বললেন আমি রাত্রে চিন্তা করে সকালে বলবো। পরদিন সকালে বাদশাহ ঘোষনা দিলেন আমি বাদশাহী ত্যাগ করে পাহাড়ী জীবন গ্রহণ করছি এবং রাজকীয় পোষাকের পরিবর্তে মামুলি পোষাক পরিধান করছি। তুমিও আমার সাথে থেকো। অতপর উভয়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন।

এ গল্প শুনে খলীফা হিশাম এমন কান্নাকাটি করলেন যে ওনার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল। তিনি তাঁর ছেলেদ্বয়কে ডেকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে

নির্জনবাসী হয়ে গেলেন এবং স্বীয় মহলে আবদ্ধ রইলেন। এ অবস্থা দেখে খেলাফতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত খালিদ বিন ছিফওয়ানকে বললেন- আপনি এটা কি করলেন? খলীফার আরাম আয়েশকে হারাম করে দিলেন। হযরত খালিদ বললেন- আমি অপারগ। আমি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি যে কোন সময় যদি কোন বাদশাহের সাক্ষাৎ মিলে, তাহলে ওনাকে নিশ্চয় আল্লাহর ভয় দেখাবো। (তারীখুল খোলাফা- ১৭৩ পৃঃ)

সবক ঃ দুনিয়াবী ধন দৌলত ও রাজত্বের উপর কখনো গর্ব করতে নেই। এ দুনিয়ার প্রাপ্যটা মোটেই স্থায়ী নয়। তা ছাড়া দুনিয়াবী ধন দৌলতের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

কাহিনী নং- ৬৪৮

মহামারী

খলীফা মনছুর একবার সিরিয়ার এক গ্রাম্য লোককে বললেন- আমার শাসন আমলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর থেকে মহামারী উঠায়ে নিয়েছেন। এর জন্য তোমাদের শুকরীয়া আদায় করা উচিত। লোকটি উত্তরে বললো- আপনার শাসন ও মহামারী উভয়টা বরাবর। আল্লাহর লাখো শুকরীয়া যে তিনি উভয়টা এক সঙ্গে আমাদের উপর নাযিল করেননি। (তারীখুল খোলাফা- ১৮৪ পৃঃ)

সবক ঃ জালিমের শাসন প্রজাদের জন্য মহামারী তুল্য।

কাহিনী নং- ৫৪৯

সাহসী পুরুষ

খলিফা মনছুর একদিন হযরত আমর বিন ওবাইদকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দরবারে গেলে মনছুর ওনাকে কিছু উপঢৌকন দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। মনছুর শপথ করে বললেন- আপনাকে এ উপঢৌকন নিতেই হবে। হযরত আমর বিন ওবাইদও শপথ করে বললেন- আমি কিছুতেই নিব না। মনছুরের ছেলে মাহদী পাশে বসা ছিল, সে বললো- আমীরুল মুমেনীন কসম খেয়েছেন, আপনি অনুগ্রহ করে এ উপঢৌকন নিয়ে নিন। তিনি বললেন, কসমতো আমিও করেছি। কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করাটা

আমীরুল মুমেনীনের জন্য আমার দিক থেকে অনেক সহজ। খলিফা মনছুর বললেন- ঠিক আছে, অন্য কোন বাসনা থাকলে পেশ করুন। তিনি বললেন, আমার বাসনা হচ্ছে, আমি নিজে এখানে না আসলে যেন আমাকে ডাকা না হয় এবং আমি আপনার কাছে কিছু না চাইলে যেন আমাকে কোন কিছু দেয়া না হয়। মনছুর বললেন, আপনি কি জানেন, আমি মাহদীকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি? তিনি বললেন, যখন আপনার মৃত্যু আসবে, তখন আপনি অন্য দিকে এমন ভাবে মশগুল হয়ে যাবেন যে এ কথার খেয়ালও আসবে না। (তারীখুল খোলাফা- ১৮৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ প্রভাবশালী রাজা-বাদশাহকে কখনো তোয়াজ করে না। তাঁরা খালেছ বন্দেগীর বদৌলতে দুনিয়াদার ও দুনিয়া থেকে বেপরোয়া হয়ে থাকেন।

কাহিনী নং- ৫৫০

নাস্তিক

আবু মুয়াবিয়া দরীর বর্ণনা করেন- আমি একদিন খলিফা হারুনূর রশীদের দরবারে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদীছটি শুনালাম- হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যে বিতর্ক হলো............."। সেই সময় সেখানে এক ভদ্রবেশী নাস্তিক লোক বসা ছিল। ওর মুখ থেকে এ কথাটি বেল হল- ঐ দু'নবীর মধ্যে সাক্ষাৎ কি করে হলো? এ কথা শুনে হারুনূর রশীদ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন- এমন ব্যক্তির সাজা হলো তলোয়ার দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা। নাস্তিক লোক রসূলের হাদীছ নিয়ে বিদ্রুপ করে। আমি আমীরুল মুমেনীনকে বললাম অজান্তে ওর মুখ থেকে এ কথাটি বের হয়ে গিয়েছে। এ বলে কোন মতে হারুনুর রশীদের রাগ প্রশমিত করলাম। (তারীখুল খোলাফা- ১৯৩ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র হাদীছের সামনে নিজের চিন্তাধারা পেশ করা এবং পবিত্র হাদীছকে নিয়ে কোন প্রকার বিদ্রুপ করা ধর্মহীনতার পরিচায়ক। এ কাহিনীদ্বারা এটাও বুঝা গেল যে আগের যুগে বড় বড় রাজা-বাদশাহদের অন্তরেও হাদীছের প্রতি সম্মানবোধ মওজুদ ছিল।

কাহিনী নং- ৫৫১

জ্ঞানের কদর

এক দিন আবু মোয়াবিয়া দরীর (অন্ধ) খলিফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে খেতে বসলেন। খাওয়ার পর ওনার হাত ধুইয়ে দেয়া হলো। অতঃপর হারুনুর রশীদ ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি জানেন আজ আপনার হাত কে ধূইয়ে দিয়েছে? আবু মায়াবিয়া বললেন, না, আমি জানি না। হারুনুর রশীদ বললেন- কেবল জ্ঞানের সম্মানার্থে আমি নিজেই আপনার হাত ধূইয়ে দিয়েছি। (তারীখুল খোলাফা- ১৯৭ পৃঃ)

সবক ঃ জ্ঞানীর জ্ঞানকে বড় বড় রাজা-বাদশাহগণও সম্মান করে থাকেন। আগের যুগের রাজা-বাদশাহ জ্ঞানীগণকে খুবই সম্মান করতেন।

কাহিনী নং- ৫৫২

রোমের বাদশাহ

১৮৭ হিজরীতে রোমের বাদশা ইকফুর একটি চিঠি লিখেছিল খলিফা হারুনুর রশীদের কাছে, যেটাতে রোমের রাণী যুবনীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কথা উল্লেখ ছিল। সে লিখেছিল- "এ চিঠি রোমের বাদশাহ ইকফুরের পক্ষ থেকে আরবের বাদশাহ হারুনের প্রতি। উল্লেখ্য যে আমার আগে রাণী যুবনীর যুগে তোমাদের অবস্থা ছিল দাবা খেলার রাজার মত আর রাণীর নির্বুদ্ধিতার কারণে ওর অবস্থা ছিল দাবা খেলার সৈনিকের মত। এ জন্য সে অনেক ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করেছে। এ চিঠি হস্তগত হওয়া মাত্র, সমস্ত ধন সম্পদ যা এ পর্যন্ত নিয়েছ সব অনতিবিলম্বে ফেরত দিয়ে দিবে। অন্যথায় তলোয়ারের মাধ্যমে ফয়সালা হবে।"

এ চিঠি পাঠ করে হারুনুর রশীদ তেলে বেগুলে জ্বলে উঠলেন, ওর চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছিল না। আশে পাশে উজির নাজির যারা ছিল, সবাই উঠে চলে গেল। হারুনুর রশীদ কোন উজীরের সাথে কোন পরামর্শ না করে তক্ষুনি দোয়াত কলম আনিয়ে ঐ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখে দিল- "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম- আমীরুল মুমেনীন

হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে রোমের কুত্তা ইকফুরের প্রতি, ওহে কাফিরের বাচ্চা, আমি তোমার চিঠি পড়েছি, যার উত্তর শীঘ্রই স্বচক্ষে দেখবে, শোনার প্রয়োজন নেই।"

অতঃপর নিজেই সেনাবাহিনী নিয়ে সেদিনই রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং রোমে পৌছে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন, যা ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইকফুর বাধ্য হয়ে সন্ধির জন্য আবেদন করলো এবং প্রতি বছর খাজনা দিতে রাজি হলো। হারুনুর রশীদ তা মনজুর করলেন এবং সেনা প্রত্যাহার করে নিলেন। (তারীখুল খোলাফা- ১৯৯ পৃঃ)

সবক ঃ সত্যিকার মুসলমান কাফিরদের কোন হুমকীর পরওয়া করেনা। ওদের গর্ব খর্ব করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। এ ধরনের মুসলমান সব সময় আল্লাহর সহায়তা লাভ করে।

কাহিনী নং- ৫৫৩

পঁয়ত্রিশ হাজার দীনার

খলিফা আবু নছর মুহাম্মদের ধনাগারের দাঁড়িপাল্লায় সামান্য তারতম্য ছিল। ধনাগারের কর্মচারীরা যেদিক হালকা সেদিক দিয়ে ওজন করে জিনিস গ্রহণ করতো এবং প্রদান করার সময় যেদিক ভারী, সেদিক দিয়ে ওজন করে প্রদান করতো। খলিফা আবু নছরের কানে এ খবর পৌছলে, তিনি সংশ্লিষ্ট উজীরের কাছে একটি কড়া চিঠি লিখলেন। চিঠির সূচনায় কয়েকটি কুরআনী আয়াত লিখলেন, যেগুলো ওজনে কম প্রদানকারীদের পরিনতি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি লিখলেন, আমি জানতে পারলাম যে আমাদের ধনাগারের পাল্লাটা নাকি ক্রটিযুক্ত এবং জিনিস পত্র গ্রহণ করার সময় হালকা দিক দিয়ে এবং প্রদান করার সময় ভারী দিক দিয়ে ওজন করে প্রদান করা হয়। যদি এ তথ্য সত্য হয়, তাহলে ধনাগারের কর্মচারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হোক যে লোকদেরকে ডেকে আগের সমস্ত ঘাটতিগুলো যেন পূর্ণ করে দেয়া হয়।

উজীর উত্তরে লিখলেন যে তদন্ত করে জানা গেল যে এ অনিয়মটা দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসছে। আনুমানিক হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দীনার লোকদের ফেরত দিতে হবে। খলিফা তদুত্তরে লিখলেন, পঁয়ত্রিশ হাজার

নয়, পঁয়ত্রিশ কোটি দীনার হলেও ফেরত দিতে হবে।(তারীখুল খোলাফা-৩১৯ পৃঃ)

সবক ঃ ওজনে কম দেয়া বড় অপরাধ। কুরআনে পাকে ওজনে কম প্রদানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যেন এ অসাধুকর্ম থেকে বিরত থাকে।

কাহিনী নং- ৫৫৪

ব্যবসায়ীদের কাজ

খলিফা আবু নছর একদিন কোষাগার পরিদর্শন করতে গেলে, কোষাগারের কর্মকর্তা ওনাকে বললেন- হুযুর, আপনার আব্বাজানের যুগে কোষাগার সব সময় ভরপুর থাকতো কিন্তু এখন আপনার উদারতা ও বদান্যতার কারণে একেবারে খালি পড়ে আছে। খলিফা আবু নছর বললেন, কি করা, আমারতো আল্লাহর পথে খরচ না করলে ভাল লাগে না আর সঞ্চয় করাতো ব্যবসায়ীদের কাজ। (তারীখুল খোলাফা- ৩১৯ পৃঃ)

সবক ঃ ধন সম্পদ যতটুকু সম্ভব, আল্লাহর পথে খরচ করা উচিৎ। ধন সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা দীনদার লোকদের কাজ নয়।

কাহিনী নং- ৫৫৫

গোপন তদবীর

খলিফা মনসুর স্বীয় শহরের কোন এক জায়গায় বসা ছিলেন। এমন সময় এক মর্মাহত ও দুঃচিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর সম্মূখ দিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি তাঁর খাদেমকে নির্দেশ দিলেন যেন ঐ লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসে। নির্দেশমত খাদেম ঐ লোকটাকে ডেকে আনলো। খলিফা ওর দুঃচিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো- আমি দেশ-বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেক মালামালের অধিকারী হয়ে ছিলাম। সব আমার স্ত্রীর কাছে সোপর্দ করে দেশের বাইরে গিয়েছিলাম। কিছু দিন পর ফিরে এসে দেখি যে আমার ঘর একেবারে খালি। স্ত্রী বললো সমস্ত মালামাল চুরি হয়ে গেছে অথচ সিদ খনন বা দেয়াল-ছাদ ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখলাম না। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন- তোমার বৈবাহিক জীবন কত বছরের? সে বললো- এক বছর হয়েছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- তোমার স্ত্রী কি কুমারী ছিল?

সে বললো- না। এর আগে ওর অন্যত্র বিবাহ হয়েছিল। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন- সেই স্বামীর ঘরে কোন সন্তানাদি ছিল? বললো- না। জিজ্ঞেস করলেন- সেই স্বামীটি যুবক, নাকি বয়স্ক? বললো- যুবক।

এ সব কিছু জেনে নেয়ার পর খলিফা তাঁর শাহী মহল থেকে এক শিশি আতর আনালেন, যেটা খুবই সুগন্ধময় ছিল এবং যেটা শুধু তাঁর জন্য তৈরী করা হতো। আতরের শিশিটা ওকে দিয়ে বললেন, এটা ব্যবহার কর, এর বদৌলতে তোমার দুঃচিন্তা দূরীভূত হয়ে যাবে। লোকটি চলে যাবার পর খলিফা তাঁর চার জন নির্ভরযোগ্য খাদেমকে ডেকে সেই আতরের ঘ্রান শুকালেন এবং বললেন- তোমরা এক এক জন শহরের এক এক প্রবেশদ্বারে গিয়ে অবস্থান কর। যাতায়াতকারীদের মধ্যে যার কাছে এ সুঘ্রান পাবে, ওকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

এ দিকে সেই হতাশ ব্যক্তি আতরের শিশিটা নিয়ে ঘরে গেল এবং স্ত্রীকে রাখতে দিয়ে বললো- এটা আমাকে আমীরুল মুমেনীন দিয়েছেন। সে শুকে দেখলো যে সত্যিই অপূর্ব সুগন্ধময় আতর। স্বামীর অবর্তমানে সেই লোকটিকে ডেকে (যাকে ঘরের সমস্ত মালামাল দিয়েদিয়েছিল) আতরটা দিয়ে দিল এবং বললো এটা ব্যবহার কর, খুবই সুগন্ধময় আতর। এটা আমার স্বামীকে আমীরুল মুমেনীন দিয়েছেন। লোকটি সেই আতর কাপড়ে লাগিয়ে শহরের এক প্রবেশদ্বার দিয়ে বের হওয়ার সময় খলীফার নিযুক্ত খাদেম ওর কাপড়ে সেই সুঘ্রান অনুভব করে ওকে ধরে ফেলে এবং খলিফার কাছে নিয়ে আসে। খলিফা ওকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি এ আতর কোথায় পেয়েছ? সে বললো- এটা আমি ক্রয় করেছি। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন- কোথায় থেকে ক্রয় করেছ? সে এর উত্তর দিতে পারলো না এবং ঘাবড়িয়ে গেল। খলিফা পুলিশ কর্মকর্তাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন- একে কারাগারে নিয়ে যাও। যদি চুরি করা সমস্ত মালামাল ফেরত দিতে রাজি হয় তাহলে মুক্তি দিবে আর যদি রাজি না হয় তাহলে এক হাজার চাবুক মারবে। পুলিশ কর্মকর্তা ওকে নিয়ে দরবার থেকে বের হলে পুনরায় পুলিশ কর্মকর্তাকে একাকী ডেকে বললেন, ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে মালামাল আদায় করতে চেষ্টা কর তবে মেরো না। নির্দেশমত পুলিশ কর্মকর্তা ওকে কারাগারে বন্দি করলো এবং ধমকালো। শেষ পর্যন্ত সে চুরি হওয়া সমস্ত মালামালের কথা স্বীকার করলো এবং সব ফেরত দিতে রাজি হলো। খলিফাকে এ খবর জানালে তিনি আসল মালিককে

তলব করলেন এবং বললেন- যদি আমি তোমার সমস্ত মালামাল তোমাকে দিয়ে দি, তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার দিবে? সে বললো, নিশ্চয়ই দিব। খলিফা বললেন, এ তোমার মালামাল গ্রহণ কর এবং তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। (কিতাবুল আজকিয়া-৭১ পৃঃ)

সবক ঃ দ্বিচারিনী মহিলারা মারাত্মক ক্ষতিকর। ওদের থেকে দূরে থাকা চায়। আগের যুগের ন্যায় পরায়ন রাজা-বাদশাহগণ নানা হেকমতের সাথে অনেক সমস্যার সমাধান করতেন।

কাহিনী নং- ৫৫৬

খুনী

খলিফা মুতাযাদ বিল্লাহের ভবন তৈরীর কাজ চলছিল। একদিন তিনি কাজ দেখছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে এক কুৎসিত নিগ্রো শ্রমিক খুবই উৎফুল্ল মন নিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের দ্বিগুণ কাজ করতেছে। এতে খলিফার মনে সন্দেহ হলো। তিনি ওকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে ঘাবড়িয়ে যায়। এতে খলিফার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি সেখানকার কর্ম তদারককারী ইবনে হামদুনকে বললেন- এ লোকটি হয়তো কোন শ্রম ছাড়া কিছু টাকার অধিকারী হয়েছে অথবা চোর, শ্রমিকের কাজ করার বেশে নিজেকে আত্ম গোপন করছে। ওকে চাবুক মার। একশ চাবুক মারার পরও যখন ওর মূখ থেকে কিছু বের হচ্ছিল না, তখন খলিফা শপথ করে বললেন, সে আসল কথা না বললে, কতল করা হবে। জল্লাদকে তলব করা হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সে মুখ খুললো এবং বললো আমাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিন, আমি সব কথা খুলে বলছি। খলিফা বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে, যদি মারাত্মক দণ্ডনীয় কোন অপরাধ না হয়ে থাকে। সে খলিফার শেষের কথাটি বুঝতে পারেনি এবং মনে করলো যে সে পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে গেল। তাই সে খোলা মনে বলে দিল- আমি দীর্ঘ দিন যাবত একটি ইটের ভাটায় কাজ করতাম। একদিন আমি ঐখানে একাকী বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তখন আমার সামনে দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে যেতে দেখলাম, যার কোমরে একটি মানিবেল্ট ছিল এবং আমার ধারনা হলো যে ওর কাছে যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে। সে টের না যায় মত আমি ওর পিছু নিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ইটভাটার এক কিনারে বসে সে বেল্ট থেকে একটি দিনার বের করলো। আমি দেখলাম বেল্টে আরও অনেক দিনার রয়েছে। আমি ওকে ঝাপটে ধরে ওর মানিবেল্টটা কেড়ে নিলাম এবং গলা চিপে ওকে মেরে ফেললাম এবং পাশের একটি গর্তে মাটিছাপা দিয়ে রাখলাম। কিছুদিন পর ওখান থেকে হাড্ডি গুলো বের করে দজলা নদীতে ফেলে দিলাম। দিনার গুলো এখন আমার কাছে মওজুদ আছে, যার ফলে আমি উৎফুল্ল। খলিফা মুতাযাদ তাঁর এক সহচরকে নির্দেশ দিলেন যেন ওর বাড়ী থেকে দিনারগুলো নিয়ে আসে। নির্দেশ মতে মানি বেল্টসহ দিনার গুলো নিয়ে আসা হলো। মানি বেল্টে হত্যাকৃত লোকটির নাম ঠিকানা লিখা ছিল। খলিফা সেই নাম ঠিকানা উল্লেখ করে শহরে প্রচারনার ব্যবস্থা করলেন। এ খবর পেয়ে এক মহিলা একটি শিশু সন্তান কোলে নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হয়ে বললো- প্রচারিত নামটি আমার স্বামীর নাম এবং আমার কোলের শিশুটি ওরই সন্তান। সে অমুক দিন ঘর থেকে বের হয়ে আর ফিরেনি। ওর কোমরে একটি মানি বেল্ট ছিল যার মধ্যে এক হাজার দিনার ছিল। আজ পর্যন্ত ওর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। খলিফা সেই মানি বেল্টটি হাজার দিনার সহ মহিলাটিকে দিয়ে দিলেন এবং সেই হত্যাকারী কালো লোকটাকে কতল করার নির্দেশ দিলেন। ওর লাশটাও সেই ইটের ভাটায় ফেলে রাখার জন্য বলা হলো। (কিতাবুল আযকিয়া- ৮০ পৃঃ)

সবক ঃ অপরাধ শত লুকানোর চেষ্টা করলেও একদিন না একদিন সেটা ফাঁস হয়ে যায়। খারাপ কাজের পরিনাম সব সময় খারাপই হয়ে থাকে। দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে অনেক অপরাধ সনাক্ত করা যায়।

কাহিনী নং- ৫৫৭

মুক্তার হার

খোরাসানের এক ব্যক্তি হজ্ব করার নিয়তে ঘর থেকে বের হয়ে বাগদাদ শরীফ পৌঁছলো। সে সেখানে তার এক হাজার দিনার মূল্যমানের একটি মুক্তার হার বিক্রি করতে চাইলো। কিন্তু কোন খরিদদার পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সে হারটি একজন সুনামধারী আতর বিক্রেতার কাছে আমানত রেখে হজ্বে চলে গেল। হজ্ব সমাধা করে ফিরে এসে আতর বিক্রেতার কাছে হারটি ফেরত চাইলে, সে

অস্বীকার করে বসলো এবং বললো আমিতো তোমাকে চিনিওনা। খোরাসানী লোকটি কিছু বলতে চাইলে, গলাধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বের করে দিল। সে সময় সেখানে অনেক লোক জমায়েত হলো। সবাই আতর বিক্রেতার পক্ষেই বললো, কেউ খোরাসানী হাজীর প্রতি সহানুভূতি দেখালো না। বেচারা বারবার তার বাস্তব কাহিনীটা বললো কিন্তু কেউ তার কথাকে মোটেই পাত্তা দিল না। অগত্যা তৎকালীন খলিফা আযদুদ্দৌলার দরবারে গিয়ে স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করে আর্জি পেশ করলো। খলিফা সব কথা শুনে বললেন, কাল সকালে তুমি আতর বিক্রেতার দোকানে গিয়ে বসবে। যদি সে বসতে না দেয়, ওর সামনের কোন একটি দোকানে বসবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চুপ বসে থাকবে। এ ভাবে তিন দিন বসে থাকবে। চতুর্থ দিন আমি সেই পথ দিয়ে যাব এবং দাঁড়িয়ে তোমাকে সালাম করবো, কিন্তু তুমি দাঁড়াবে না। শুধু ওয়ালাইকুমুস সালাম বলে নিশ্চুপ বসে থাকবে। আমি যা প্রশ্ন করবো, শুধু সেগুলোর উত্তর দিবে, অন্য কোন কথা বলবে না। আমি চলে যাওয়ার পর তুমি আতর বিক্রেতার কাছে পুনরায় হারের কথাটা উঠাবে এবং সে কি বলে আমাকে জানাবে আর হারটা যদি ফেরত দেয়, আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ পরিকল্পনা মুতাবিক, পর দিন সকালে খোরাসানী লোকটি আতর বিক্রেতার দোকানের সামনে বসতে গেল কিন্তু আতর বিক্রেতা বসতে দিল না। তখন সে পাশের অন্য একটি দোকানের সামনে গিয়ে বসে পড়লো। এ ভাবে তিন দিন পর্যন্ত বসে রইলো। চতুর্থ দিন খলিফা আযদুদ্দৌলা সাঙ্গপাঙ্গসহ সেই পথ দিয়ে যাবার সময় খোরাসানী লোকটিকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বললেন। লোকটি স্বীয় জায়গায় বসাবস্থায় ওয়া আলাইকুমুস সালাম বললো। খলিফা বললেন, 'ভাই সাহেব, কি আশ্চর্য! আপনি এখানে তশরীফ আনলেন, অথচ আমার সাথে দেখা করলেন না'। লোকটি দু'এক কথা বলে নিশ্চুপ রইলো। খলিফা বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে ওকে দরবারে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। খলিফার কারণে সাঙ্গপাঙ্গ সবাইকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। এতে উপস্থিত লোকদের এ ধারনা হলো যে এলোকটি নিশ্চয় খলিফার বিশেষ বন্ধু। এ দিকে এ দৃশ্য দেখে আতর বিক্রেতার হৃদকম্পন বেড়ে গেল। সে ধারনা করলো যে খোরাসানী লোকটি খলিফাকে এখনো হারের কথা বলেনি। যদি বলে দেয়, আল্লাহ জানে আমার কি পরিনতি হয়। খলিফা যখন ওখান থেকে চলে গেলেন, তখন আতর বিক্রেতা নিজেই খোরাসানী লোকটির কাছে এসে বললো-

ভাই, আপনি যে আমাকে হার দিয়েছেন বলছেন, আমারতো কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। আপনি তো এটা বললেন না যে হারটি আমাকে কখন দিলেন এবং সেটা কিসে মোড়ানো ছিল? লোকটি যখন সব কিছু বললো, তখন আতর বিক্রেতা এ দিক সেদিক তালাশ করার ভান করে একটি থলি বের করলো, যার মধ্যে হারটি ছিল। সে চিৎকার করে বলে উঠলো- 'হারটি পাওয়া গেছে, বাস্তবিকই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যাগগে, শুকরিয়া, হারটি পাওয়া গেল। আপনার হারটি আপনি নিন। হারটি পেয়ে লোকটি সোজা খলিফার কাছে গেল। খলিফা তাঁর এক জাল্লাদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে হারটি সহ আতর বিক্রেতার কাছে পাঠালেন। জাল্লাদ আতর বিক্রেতার দোকানে গিয়ে ওকে ধরে গলায় হারটি পরিয়ে দোকানের দরজায় ফাঁসিতে লটকিয়ে দিল এবং ঘোষনা করলো- এটা আমানত খেয়ানতকারীর সাজা। দিনের শেষে ওর গলা থেকে হারটি নিয়ে খোরাসানী লোকটিকে দিয়ে দিল এবং ওকে চলে যেতে বললো। (কিতাবুল আজকিয়া- ৯৩ পৃঃ)

সবক ঃ আমানত খেয়ানত করা বড় অপরাধ। আগের যুগের ন্যায় পরায়ন রাজা বাদশাহগণ নানা হেকমতের সাথে অপরাধীদেরকে পাকড়াও করতেন। বর্তমান অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাহিনী নং- ৫৫৮

বিষ মিশানো হালুয়া

খলিফা আযদুদ্দৌলার রাজত্বকালে কুর্দী ডাকাতদের উপদ্রব খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তারা পাহাড়ী ঘাঁটি সমূহে লুকিয়ে থাকতো এবং সুযোগ বুঝে এদিক সেদিক যাতায়াতকারী কাফেলাদের সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে নিত। ওদেরকে দমন করা খুবই মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। খলিফা আযদুদ্দৌলা অতিষ্ট হয়ে একটি ফন্দি করলেন। তিনি এক ব্যবসায়ীকে ডেকে একটি গাধা সোপর্দ করলেন, যার পিঠে ছিল দুটি সিন্দুক এবং সিন্দুকের মধ্যে ছিল খুবই উন্নত মানের হালুয়া, যার সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হালুয়াগুলো খুবই সুন্দর পাত্রে সাজিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। খলিফা সেই ব্যবসায়ীকে গাধাটি হস্তান্তর করে নির্দেশ দিলেন, অমুক কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে যাও এবং কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে খলিফা আযদুদ্দৌলার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে অমুক প্রশাসক ও ওনার পরিবারের জন্য

শাহী হালুয়া নিয়ে যাচ্ছি। ব্যবসায়ী লোকটি শাহী হুকুম মুতাবিক কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ডাকাত কবলিত এলাকা অতিক্রম কালে চারিদিক থেকে ডাকাত দল এসে কাফেলায় আক্রমন করলো এবং সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে নিল। সেই গাধাটিও ওরা করায়াত্ত করলো। যখন সিন্দুকদ্বয় খুললো, তখন হালুয়ার অপূর্ব সুগন্ধ চারিদিক ছড়িয়ে পড়লো। ডাকাত দলের সবাই ভীষন আকৃষ্ট হয়ে হালুয়ার পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলো। অল্পক্ষনের মধ্যে এদিক সেদিক ঢলে পড়ে সবাই মারা গেল। কাফেলার লোকেরা আশ্চর্য হয়ে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। যখন ডাকাত দলের সবাই মারা গেল, তখন তারা নিজ নিজ জিনিস পত্র নিয়ে নিল এবং ওদের হাতিয়ারগুলোও তারা কব্জা করলো। (কিতাবুল আজকিয়া- ৯৭ পৃঃ)

সবক ঃ লুটপাট করে কেউ কোন দিন চির শান্তি লাভ করতে পারে না। জালিমেরা কখনো কামিয়াব হতে পারে না। দ্বীনী-দুনিয়া-আখেরাত কোন জায়গায় ওদের রেহায় নেই।

কাহিনী নং- ৫৫৯

তরমুজ

সুলতান জালালুদ্দৌলা একদিন শিকারে যাবার সময় পথে ক্রন্দনরত এক গ্রাম্য লোককে দেখলেন। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাদ্‌তেছ? সে বললো, আমার কাছে একটি তরমুজ ছিল, যেটায় আমার সম্পূর্ণ পূঁজি বিনিয়োগ ছিল। তিনটি ছেলে আমার থেকে তরমুজটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সুলতান বললেন- তুমি সেনা ছাউনিতে গিয়ে অমুক জায়গায় অপেক্ষা কর। আমি সন্ধ্যায় ফিরে এসে তোমাকে সন্তুষ্ট করবো। লোকটি সেনা ছাউনিতে গেল এবং সুলতানের বর্ণিত জায়গায় গিয়ে বসে রইলো। সুলতান সেনা ছাউনিতে ফিরে এসে তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন- আমার তরমুজ খেতে ইচ্ছে করছে। সেনা ছাউনিতে তালাশ করে দেখ। হয়তো কারো কাছে পাওয়া যেতে পারে। ঠিকই তাঁর কর্মচারীরা এদিক সেদিক তালাশ করে একটি তরমুজ খুঁজে পেল এবং সেটা সুলতানের কাছে নিয়ে আসলো। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, এ তরমুজ কার কাছে পাওয়া গেছে? তাঁকে বলা হলো যে অমুক সিকিউরিটি গার্ডের তাবুতে পাওয়া

গেছে। সুলতান সেই সিকিউরিটি গার্ডকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। গার্ড হাজির হলে ওকে জিজ্ঞেস করলেন- এ তরমুজ কার থেকে নিয়েছ? সে বললো- তিনজন ছেলে এ তরমুজটি নিয়ে এসেছিল। সুলতান বললেন, সেই ছেলেগুলোকে আমার সামনে নিয়ে এসো। গার্ড যেতে যেতে চিন্তা করলো- অবস্থা বেগতিক মনে হচ্ছে। হয়তো সুলতান ছেলেদের কতল করার নির্দেশ দিতে পারে। তাই সে গিয়ে ছেলেদেরকে তাড়িয়ে দিল এবং সুলতানের কাছে ফিরে এসে বললো ছেলেগুলো পালিয়ে গেছে। সুলতান গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সেই তরমুজ যেটা তোমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল? সে বললো- জ্বি হ্যা। সুলতান গার্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি একে নিয়ে যাও। এ আমার গোলাম। আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, কারণ সে ঐ ছেলেগুলোকে হাজির করতে পারেনি, যারা তোমার তরমুজ ছিনিয়ে নিয়েছিল। খোদার কসম, যদি তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমি তোমার গরদান উড়ায়ে দিব। অতপর সে গার্ডকে নিয়ে দরবার থেকে বের হয়ে আসলো। গার্ড তিনশ দিনার দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ওকে সম্মত করালো এবং তিনশ দিনার দিয়ে মুক্ত হলো। গ্রাম্য লোকটি পুনরায় সুলতানের কাছে এসে বললো, হুযূর, আমি ওকে তিনশ দিনারে বিক্রি করে দিয়েছি। সুলতান বললেন, তুমি কি এতে খুশী? সে বললো, খুবই খুশী। সুলতান বললেন, ঠিক আছে, দিনার গুলো সাবধানে নিয়ে চলে যাও। (কিতাবুল আজকিয়া- ১০০ পৃঃ)

সবক ঃ ন্যায় পরায়ন শাসক ফরিয়াদকারী ও মজলুমদের সাহায্য করে থাকেন।

কাহিনী নং- ৫৬০

যবের রুটি

হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহু আনহু) একদিন খবর পেলেন যে সেনা বাহিনী প্রধানের বাবুর্চি খানার দৈনিক খরচ এক হাজার দিরহাম। এ খবর পেয়ে তিনি খুবই আফসোস করে বললেন- দুঃস্থ, ইয়াতীম ও অসহায়দের হক এ ভাবে অপচয় করা হচ্ছে। আমীরুল মুমেনীন সেনা প্রধানকে পর দিন দুপুরে তাঁর সাথে খাবার গ্রহনের জন্য দাওয়াত দিলেন। এ দিকে বাবুর্চিকে সব রকমের

আকর্ষনীয় খাবার তৈরী করার নির্দেশ দিলেন, এর সাথে যবের রুটিও তৈরী করতে বললেন। পরদিন সেনাপতি দাওয়াত খেতে আসলে খলিফা খাবার পরিবেশনের অর্ডার দিতে একটু দেরী করলেন। এ দিকে সেনাপতি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়লেন কিন্তু আদবের খাতিরে কিছুই বলতে পারছিলেন না। যখন ক্ষুধার করুন অবস্থা ওনার চেহারায় ফুটে উঠলো, তখন খলিফা খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। প্রথমে যবের রুটি আনা হলো। সেনাপতি যেহেতু খুবই ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই খলিফার সাথে যবের রুটি খেতে শুরু করলেন। যখন উন্নত মানের খাবার গুলো আনা হলো, তখন ওনার পেট যবের রুটিতে ভরে গিয়েছিল। বুদ্ধিমান খলিফা সেনাপতিকে উন্নত খাবারের দিকে ইশারা করে বললেন, আপনার খাবার গ্রহণ করুন। সেনপতি আপারগতা প্রকাশ করে বললেন যবের রুটিতে আমার পেট ভরে গেছে, এখন আর কিছু খেতে পারবো না। আমীরুল মুমেনীন বললেন- "সুবহানাল্লাহ! কীযে ভাল খাবার! পেটও ভরে, খরচও খুবই কম। এক দিরহামে দশজন পেট ভরে খেতে পারে। আফসোসের বিষয়, আপনি আপনার খাবারে দৈনিক এক হাজার দিরহাম খরচ করেন। সেনাপতি সাহেব, আল্লাহকে ভয় করুন, নিজেকে অপচয় থেকে মুক্ত রাখুন। যে টাকা আপনি আপনার বাবুর্চি খানায় অনর্থক খরচ করতেছেন, সে টাকা ভূখা, অভাবী ও গরীবদেরকে দান করুন। আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট হবেন"। খলিফার উপদেশমূলক এ সব কথাবার্তা সেনাপতির মনে দারুন রেখাপাত করলো এবং মনে মনে শপথ নিলেন যে আগামীতে আর এ রকম খরচ করবেন না। (মগনিউল ওয়ায়েজীন- ৪৯১ পৃঃ)

সবক ঃ অপব্যয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ। খানাপিনা ও পোষাক-পরিচ্ছদে সাদা সিধে ও মধ্যম প্রন্থা অবলম্বন করা চায়। যে ব্যক্তি খানাপিনায় ও পোষাক-পরিচ্ছদে অতিরিক্ত খরচ করে, সে গরীর ও অভাবীদের হক আত্মসাৎ করে।

কাহিনী নং- ৫৬১
পেঁচার কাহিনী

এক রাত্রে বাদশাহ আবদুল মালেক বিন মরওয়ানের ঘুম আসতেছিল না। তিনি তাঁর দরবারের গল্পকারকে ডেকে এনে বললেন- 'কোন একটি কাহিনী শুনাও। গল্পকার বললো- আজ আমি আপনাকে এক অপূর্ব কাহিনী শুনাবো। অতপর বলতে শুরু করলো- এক ছিল বসরার পেঁচা আর এক ছিল মুসলের পেঁচা। একদিন মুসলের পেঁচার ছেলের জন্য বসরার পেঁচার মেয়ের প্রস্তাব দিল। বসরার পেঁচা বললো- যদি আমার মেয়ের মোহরানা বাবত একশ ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম দিতে পার, তাহলে রাজি আছি। মুসলের পেঁচা বললো, আমি এত তাড়াতাড়ি এত ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরান ভূমি কোত্থেকে সংগ্রহ করবো। তবে দুআ কর, যেন আমাদের বাদশাহ আবদুল মালেক সহীহ সালামতে থাকেন। যদি তিনি এক বছরও শাসক হিসেবে বহাল থাকেন, তাহলে একশ ধ্বংস প্রাপ্ত গ্রাম অনায়সে দিতে পারবো। আবদুল মালেক এ কথা শুনে চমকে উঠলেন এবং যা বুঝার আছে বুঝে গেলেন। তিনি তখনই স্বীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার সংকল্প করলেন। (হায়াতুল হায়ওয়ান- ১৩৫ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ শাসকদের জুলুম অত্যাচারে দেশ ধ্বংস হয়ে যায়। এ জন্য জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকা চায়।

কাহিনী নং- ৫৬২
খলিফা হিশাম ও হযরত তাউস (রাঃ)

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালেক যখন মদীনা মনোয়ারা গেলেন, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন- সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে থেকে কোন এক জনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকেরা আরয করলেন, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামতো ইন্তেকাল করেছেন। বললেন, তাহলে তাবেয়ীনের মধ্যে থেকে কোন একজনকে নিয়ে এসো। লোকেরা গিয়ে হযরত তাউস (রাঃ) কে নিয়ে আসলো। তিনি ভিতরে গিয়ে জুতা খুললেন এবং বললেন, হে হিশাম, আস্‌সালামু আলাইকুম। খলিফা হিশাম খুবই রাগান্বিত হলেন এবং ওনাকে কতল করে ফেলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন।

লোকেরা খলিফার কাছে আরয করলো- এ জায়গাটা হচ্ছে রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র হেরম শরীফ আর ইনি হচ্ছেন আকাবেরে ওলামায়ে কিরামের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনি এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। খলিফা হযরত তাউসকে জিজ্ঞেস করলেন- হে তাউস, আপনি এ রকম আচরন কেন করলেন? তিনি বলরেন, আমি কি করলাম? খলিফা আরও ক্ষেপে গেলেন এবং বলরেন, আপনি চারটি বেআদবী করেছেন:

প্রথমতঃ আপনি আমার সামনে জুতা খুলেছেন (উল্লেখ্য যে এ কাজটা হিশামের দৃষ্টিতে অশোভনীয় ছিল বরং ওনার সামনে মোজা-জুতাসহ বসে যাওয়াটাই ভদ্রতা।')

দ্বিতীয়ত ঃ আমাকে আমীরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করা হয়নি।

তৃতীয়ত ঃ আমার নাম ধরে সম্বোধন করেছেন, আমার কুনিয়তী নাম উল্লেখ করেননি (এটাও আরবীদের কাছে অপছন্দনীয়।)

চতুর্থত ঃ আমার বিনা অনুমতিতে বসে গেছেন।

হযরত তাউস (রাদি আল্লাহু আনহু) এ চার আপত্তির জবাবে বললেন ঃ

(১) আপনার সামনে জুতা খুলে ফেলার কারণ হচ্ছে আমি দৈনিক পাঁচ বার রাজাধিরাজের সামনে জুতা খুলে গমন করি। এতে তিনি কখনো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নি।

(২) আপনাকে আমিরুল মুমেনীন এ জন্য বলিনি যে আপনার রাজত্বে সবের সমর্থন নেই। তাই আপনি এ সম্বোধনের প্রাপ্য নন।

(৩) আপনাকে কুনিয়তী নাম ধরে না ডেকে আসল নাম ধরে ডাকার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়জনদের কে নাম ধরে ডেকেছেন যেমন- ইয়া দাউদ, ইয়া ইয়াহিয়া, ইয়া ঈসা ইত্যাদি এবং দুশমনকে কুনিয়তী নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন- تبت يدا ابى لهب

(৪) আপনার সামনে বিনা অনুমতিতে বসে যাওয়ার কারণ হচ্ছে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেছেন, যদি কেউ কোন দোযখীকে দেখতে চায়, তাহলে ওকে বল, এমন লোককে দেখে নেয়, যে স্বয়ং বসে আছে আর অন্যান্য লোকেরা ওর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। খলীফা হিশামের কাছে এ কথা গুলো খুবই পছন্দ হলো এবং হযরত তাউসকে বললেন- আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন, হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে দোযখে পাহাড়ের সমতুল্য সাপ এবং উটের সমতুল্য বিচ্ছু রয়েছে। ওগুলো এমন সব শাসকদের পথ চেয়ে থাকে যারা প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচার করে না। এ কথাটি বলে তিনি চলে গেলেন। (মগনিউল ওয়ায়েজীন- ৩১৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ দুনিয়াবী কোন দাপটকে পরওয়া করেন না এবং বিবেকবান শাসকগণ হক কথার কদর করে থাকেন।

কাহিনী নং- ৫৬৩

গরীব দরদী

একবার খলীফা মামুনুর রশীদ সৈন্য সামন্ত সমেত জংগলে শিকার করতে যাচ্ছিলেন। এক গ্রাম্য লোক এক মোশক পানি নিয়ে তাঁর সামনে এসে বললো- এ শীতল ও মজাদার পানি আপনার জন্য হাদিয়া হিসেবে এনেছি। খলিফা মামুন ওখান থেকে একটু পান করলেন। পানিটা খুবই দুর্গন্ধময় ও তিক্ত ছিল। কিন্তু খলিফা ওর কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না বরং বললেন- "বাস্তবিকই এ রকম পানি আমি আর কখনো পান করিনি। ঠিক আছে, তুমি পানিটা একটি পাত্রে ঢেলে রেখ এবং আমার কোষাগারে গিয়ে তোমার এ মোশকে স্বর্ণমুদ্রা ভরে সহসা তোমার ঘরে ফিরে যাও।" সে চলে যাবার পর খলিফার সফর সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন- পানি যখন এত তিক্ত ছিল, আপনি ওকে কিছু বললেন না কেন? এবং পান করলেনইবা কেন? আবার ওকে বখশীশও কেন দিলেন? আর ওকে সামনের দিকে যেতে বাঁধা দেয়ার রহস্যটা কি? খলিফা মামুন বললেন- বেচারা গ্রাম্য লোকটি একান্ত আগ্রহ নিয়ে অনেক দূরের কোন কূয়া থেকে পানি আমার জন্য এনেছে। আমি সে পানি কি করে তিক্ত বলতে পারি? সে যখন পানির মোশকটা আমার হাতে দিয়েছে, তখন পানি পান না করাটা আমার কাছে লজ্জাকর লেগেছে। ওকে বখশীশ এ জন্য দিয়েছি যে বেচারা বখশীশের আশায় এতদূর থেকে পানি নিয়ে এসেছে। আর আমি ওকে সামনের দিকে যেতে না দিয়ে বাড়ীতে ফেরত পাঠানোর কারণ হলো সে যদি বাগদাদ গিয়ে দজলা নদীর সুমিষ্ট পানি পান করে, তাহলে সে মনে মনে খুবই লজ্জিত হবে। (মগনিউল ওয়াযাজীন- ৩১৯ পৃঃ)

সবক ঃ গরীবদের আন্তরিকতার কদর করা উচিত এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো মহানুভবতার পরিচায়ক।

কাহিনী নং- ৫৬৪

দুই মলাউন

সুলতান নুরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন জঙ্গী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক রাত্রে স্বপ্নে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার লাভ করেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দু'ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বললেন- 'নুরুদ্দীন! আমাকে এদের অপকর্ম থেকে হেফাজত কর।' দ্বিতীয় রাতও স্বপ্নে হুযুরের দীদার লাভ করলেন এবং হুযুর একই কথা ফরমালেন। তৃতীয় রাত পুনরায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তশরীফ আনলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন- 'নুরুদ্দিন! আমাকে এদের অপকর্ম থেকে হেফাজত কর।

সুলতান নুরুদ্দীন যখন লাগাতার তিন রাত হুযূরকে স্বপ্ন দেখলেন এবং দু'ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বলতে শুনলেন- 'আমাকে এদের অপকর্ম থেকে হেফাজত কর' তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং স্বীয় ঈমানী শক্তি বলে বুঝতে পারলেন যে মদীনা মনোয়ারায় নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, যার কারণে আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় বার যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন রাতের কিছু অংশ বাকী ছিল। সুলতান তখনই বিছানা থেকে উঠে পড়লেন এবং কোষাগার থেকে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে বিশজন সহচর সহ দামস্ক থেকে মদীনা মনোয়ারার দিকে যাত্রা দিলেন। ষোল দিন পথ অতিক্রম করার পর মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছে সুলতান চারি দিকে এলান করে দিলেন- আজ মদীনাবাসীদের উপর দিনার দিরহাম বর্ষিত হবে অর্থাৎ মদীনা বাসীদের মধ্যে অকাতরে দিনার দিরহাম বিতরণ করা হবে। এ খবর শুনে বড় ছোট সবাই সুলতান নুরুদ্দীনের আস্তানায় এসে লাইন ধরলেন। একে একে প্রত্যেককে দিনার দিরহাম দিয়ে বিদায় করতে লাগলেন। এ ভাবে সারা শহর বাসী ওনার অনুসন্ধিৎসু চোখের সামনে দিয়ে গেলেন। কিন্তু স্বপ্নে দৃষ্ট সেই দু'ব্যক্তি, যাদের আকৃতি ওনার স্মৃতি পটে জাগরুক ছিল, দেখা গেল না। রওজা পাকের কয়েক জন খাদেমকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন- এমন কেউ কি রয়ে গেছে, যে আমার থেকে বখশীশ নিতে আসে নি? ওনারা আরয করলেন, আমাদের জানা মতে সবাই হাজির হয়েছে। মাত্র দু'বুজুর্গ ব্যক্তি আসেননি। তাঁরা পশ্চিমা দেশের অধিবাসী।

দিন রাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন। দুনিয়াবী উপঢৌকনের কোন লালসা ওনাদের নেই। সুলতান বললেন- আমি ওনাদেরকে এক নজর দেখতে চাই।

কিছুক্ষণ পর সেই দু'জনকে সুলতানের সামনে আনা হলো। সুলতান তাদেরকে দেখা মাত্র শিউরে উঠলেন। কারণ এ দু ব্যক্তি তারাই, যাদের সম্পর্কে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইশারা করেছিলেন। সুলতান ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কোথায় থাকো? তারা বললো- রাওজা পাকের পশ্চিম দিকে মসজিদে নব্বীর দেয়াল সংলগ্ন একটি নির্জন কুঠুরী আছে, ওখানেই আমরা থাকি। সুলতান ওদেরকে সেখানে রেখে নিজে সোজা ওদের সেই কুঠুরীতে গিয়ে চারিদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে থাকালেন। আপত্তিকর এমন কিছু চোখে পড়লো না। ঘরে যে সামান্য আসবাব পত্র ছিল, এতে ওদের দরবেশী জিন্দেগীর সাক্ষ্য বহণ করছিল। ঘরের তাকে কুরআন মজিদ রক্ষিত ছিল, এ ছাড়া উপদেশমূলক কিছু ধর্মীয় গ্রন্থও ছিল। ঘরের এক কোনায় ফকীর মিসকিনদের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে কিছু গম রাখা হয়েছিল। আর ঘরের মেঝেতে একটি বড় মাদুর বিছানো ছিল। এ সবের মধ্যে আপত্তিকর কিছু ছিল না। সুলতান চিন্তা করতে লাগলেন- এখন কি করা যায়। তাঁর সেই পবিত্র জজবা, যেটা ওনাকে দামেস্ক থেকে মদীনায় নিয়ে এসেছে, তা কিছুতেই দমিবার নয়। অদমনীয় স্পৃহা মাদুরটাকে উলটায়ে দেখতে আগ্রহান্বিত করলো। তিনি মাদুরটা উল্টাতেই এক ভয়াল দৃশ্য উৎঘাটন হলো। মাদুরের নীচে এক সুড়ঙ্গ দেখা গেল, যার গতিপথ ছিল রওজা পাকের দিকে। পাশে আর একটি গর্ত ছিল, সেখানে খননকৃত মাটি রাখা হতো এবং রাত্রে সেই মাটি থলিতে ভরে জান্নাতুল বকিতে ফেলে আসতো।

সুলতান ঐ দু'জনকে সেখানে ডেকে এনে রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- সত্যি সত্যি বল তোমরা কারা? এবং তোমরা এ কাজ কেন করেছ? প্রথমে তারা আবোল তাবোল বলতে চাইলো কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে ও মৃত্যুদণ্ড অবধারিত জেনে নির্ভিক হয়ে বললো- আমরা হলাম খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাসী। আমাদের স্বজাতি আমাদেরকে এ দায়িত্ব দিয়েছিল যে হাজীদের বেশে মদীনায় পৌছে লোকচক্ষুর অগোচরে সুরঙ্গ খনন করে আপনাদের নবীর লাশ কবর থেকে বের করে যেন বেইজ্জত করি। (মাজাল্লা) আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সুরঙ্গ কবরের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। হঠাৎ ভয়াল বজ্রপাত সহকারে বৃষ্টি শুরু হয়,

ভুমিকম্প আরম্ভ হয় এবং এর পরই আপনি এসে পৌছেছেন।

এ সব শুনে সুলতান একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কলিজা পানি হয়ে চোখ দিয়ে বের হয়ে আসলো। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে আবার সারা শরীরে জালালিয়াতের ভাব এসে গেল। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সেই সুরঙ্গের পাশে উভয়কে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এবং তাদের নাপাক লাশ একটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে বললেন- রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বেআদবীকারীদের এ রকম শাস্তি হওয়া চায়। এরপর সুলতানের নির্দের্শে রাওজা পাকের চারিদিকে গভীর পরিখা খনন করে সীসা ডালা প্রাচীর তৈরী করে দেয়া হয়েছে.যেন ভবিষ্যতে কোন মলাউন সুরঙ্গ খননকারীর হাত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আরামগাহ পর্যন্ত পৌছতে না পারে। (জজবুল কুলুব- ১২৪ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রাওজা মোবারকে শায়িত অবস্থায়ও জীবিত আছেন এবং সমগ্র জগতের নেক ও বদ আমল অবলোকন করছেন এবং সব কিছু জানেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যে হায়াতুনন্নবী এবং তাঁর পবিত্র শরীর যে অক্ষত আছে, সেটা খৃষ্টানরাও বিশ্বাস করে। এ জন্যইতো রওজাপাক থেকে হুযূরের দেহ মুবারক বের করে ফেলার জন্য সুদূর খৃষ্টান জগত থেকে এসেছিল। যে সব নামধারী মুসলমান বলে যে হুযূর মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন, তারা ঐ সব খৃষ্টান থেকেও অধম। বাহ্যিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত, ইবাদত বন্দেগী, দান খয়রাত ও নেক বান্দাদের বেশভূষা অবলম্বন সত্যিকার ঈমানদারের পরিচায়ক নয়। এমন অনেক লোক আছে, যাদেরকে বাহ্যিক ভাবে অনেক বড় নেককার মনে হয়, কিন্তু আকীদাগত ভাবে ওরা নবীর সাথে বেআদবীকারী নবীর দুশমন হয়ে থাকে। এ জন্যই স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ সব লোকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ذِيَابٌ فِى ثِيَاتٍ এ সব লোক মানুষের পোষাকে নেকড়ে বাঘ। মাওলানা রুমি (রহঃ) বলেছেন-

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس نہ درہر دست باید داد دست

অর্থাৎ অনেক শয়তানও মানুষের বেশে ঘুরাফেরা করছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আস্থাবান হওয়া উচিৎ নয়। বরং যাচাই-বাচাই করার জন্য কিছু মাপকাটি তৈরী করা দরকার।

সুলতান নুর উদ্দিন বড় ভাগ্যবান বাদশাহ ছিলেন। যাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ কাজের জন্য মনোনিত করেছিলেন।

কাহিনী নং- ৫৬৫
জন্তিয়ালা দূর্গ

আফগানিস্তানের বাদশাহ আহমদ শাহ দরানী একবার তাঁর কান্দাহারস্থ রাজ প্রাসাদে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ অর্ধ রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়লেন এবং তিনশত ঘোড় সওয়ারী সৈনিক সাথে নিয়ে, যারা রাজ প্রাসাদের শাহী দরজায় পাহারারত ছিল, বের হয়ে পড়লেন। যাত্রা কালে বাদশাহ কোন একজনকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে এ মুহূর্তে যেন ওজীরে আযম শাহ ওলী খানকে অবহিত করা হয় যে বাদশাহ জিহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ওলী খানকে মধ্য রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে এ খবর দেয়া হলে তিনি হতচকিত হয়ে উঠেন! এমন কি ঘটে গেল, বাদশাহ আমার সাথে কোন পরামর্শ না করে এ ভাবে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যা হোক তিনি কালবিলম্ভ না করে এ বিষয়ে অর্থাৎ বাদশাহ জিহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হওয়ার কথা উল্লেখ করে শাহী ফরমান লিখে দেশের বিভিন্ন এলাকার সরদারদের নামে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বাদশার কাছে পৌছে যায়। অতঃপর ওজীরে আযম শাহ ওলী খান উপস্থিত সৈন্য সামন্ত যা ছিল, সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। বাদশাহ দরানী পাহাড় পর্বত, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট, পাড়ি দিয়ে খুবই দ্রুত গতিতে সিন্দ, জিলাম, ছনাব, দরাবী প্রভৃতি এলাকা অতিক্রম করে যখন লাহোর পৌছলেন তখন তাঁর সাথে ছিল মাত্র বারজন সফর সঙ্গী, বাকী সব পিছনে পড়ে রয়েছিল।

রাবী নদী পার হওয়ার পর বাদশাহ এক প্রথিককে জিজ্ঞেস করলেন- শিখরা কোথায় অবস্থান নিয়েছে? লোকটি বললো পাঞ্জাবের সমস্ত শিখরা একত্রিত হয়ে জন্তিয়ালা দূর্গ অবরোধ করে রেখেছে, যেটা অমৃতশ্বর থেকে সাত কিলোমিটার

দূরে অবস্থিত। দূর্গে কয়েক জন নওমুসলিম অবরুদ্ধাবস্থায় আছে, যারা গুরু নানকের অনুসারী সন্যাসী ছিল। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাদেরকে দূর্গের সামনে আজান দেয়া থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তারা কিছুতেই আযান দেয়া থেকে বিরত থাকতে রাজি নয়। ফলে লাগাতার অবরোধের কারণে তাদের অবস্থা মারাত্মক সংকটপূর্ন হয়ে পড়েছে। সত্তর আশি হাজার লোক দূর্গ অবরোধ করে রেখেছে। বাদশাহ এ খবর শোনা মাত্র জন্ডিয়ালার দিকে রওয়ানা হলেন, শিখেরা যখন খবর পেল যে বাদশাহ দরানী জন্তিয়ালার দিকে রওয়ানা হয়েছেন, তখন সবাই অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে গেল। দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থানরত নও মুসলিমরা দেখলো যে শিখেরা কোন হামলা ব্যতিরেকে অবরোধ ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে। তারা মনে করলো যে তাদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য এ কাজ করছে। তারা আশ্বস্ত হয়ে দূর্গের দরজা খুললে ওরা হঠাৎ এসে দূর্গে প্রবেশ করে আক্রমন করবে। গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নেয়া হলো, অনেক দূর পর্যন্ত শিখদের কোন নাম নিশানা পাওয়া গেল না। তবে দু'কিলোমিটার দূরে এমন এক ব্যক্তিকে দেখা গেল, যিনি কেবলা মুখি হয়ে একটি গাছের নিচে বসে আছেন যার মাথায় মুকুট রয়েছে। দু'ব্যক্তি একটি মোটা পশমী চাদর ওনার মাথার উপর ধরে ছায়া দিচ্ছে এবং অদূরে দশ জন সৈনিক তাদের বন্দুকগুলো মাটির উপর খাঁড়া করে রেখে সুশৃঙ্খল ভাবে দাড়িয়ে আছে। নও মুসলিমরা এ খবর পেয়ে বুঝে গেলেন, এ নিঃসন্দেহে আহমদ শাহ দরানী যিনি আমাদের সাহাযার্থে এসেছেন। অতঃপর সেখানকার রেওয়াজ মোতাবিক কিছু উপঢৌকন ও কয়েকজন সহচর সহ জন্তিয়ালার সরদার বাদশাহ দরানীর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি দেখলেন যে বাদশাহ একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে আছেন এবং দু'ব্যক্তি তার উপর চাদর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জন্দিয়ালার সরদার যথাযোগ্য সম্মান পূর্বক বাদশাকে বললেন- বোধ হয় এখনও এক ঘন্টা হয়নি, শিখদের অগনিত সৈন্য আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল। আপনার আগমনের খবর পেয়ে পালিয়ে গেছে। এখনও বেশীদূর যায়নি। সম্ভবতঃ আশে পাশেই আছে। তাই দূর্গের পাশেই আপনার তশরীফ রাখাটা সমীচীন মনে করি। বাদশাহ বললেন, কোন ভয় নেই। আমি এখানেই অবস্থান করবো। এর কিছুক্ষণ পর জন্তিয়ালাবাসী দেখলো- একের পর এক রাজ

কীয় সৈন্য বাহিনী আসতেছে। সন্ধ্যা নাগাদ ওজীরে আযম শাহ ওলী খানও এসে পৌঁছলেন। এরই মধ্যে প্রায় তিন হাজার সৈন্য জমায়েত হয়ে গেল। ওখানেই তাবু স্থাপন করা হলো। সকাল হতে না হতে আরও ছয় হাজার অশ্বারোহী উপস্থিত হয়ে গেল। শিখদের গতি বিধি জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হলো। ওজীরে আযম শাহ ওলী খান বাদশাহের কাছে এ ভাবে তাড়াহুড়া করে বিনা সাজ সরঞ্জামে শত্রুদেশে আগমনের রহস্য জানতে চাইলে বাদশাহ দরানী বলেন- আমি ঐ দিন অর্ধরাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন- 'হে আহমদ শাহ দরানী, উঠ, এ মূহুর্তে পাঞ্জাবের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানের জন্তিয়ালা এলাকায় এক দল ইসলামী অনুসারীকে শিখেরা অবরোধ করে রেখেছে এবং তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম, যেন হুযূরের নির্দেশ পালনে এক মূহূর্তও দেরী না হয়। তাই সৈন্য সামন্ত জামায়েত ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য দেরী করাটা সমীচীন মনে করিনি। আল্লাহ তাআলার ফজল ও করমের উপর ভরসা করে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

এ স্বপ্নের কথা শুনে সৈন্যদের মনে জিহাদী জজবা শত গুনে বৃদ্ধি পেল। দুই দিন জন্তিয়ালায় অবস্থান করার পর শিখদেরকে চরম শিক্ষা দিয়ে অবশেষে আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। (ইয়াদে মাজী- ১১৪ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জীবিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে অবহিত। এখনও বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করে থাকেন। আহমদ শাহ বড় সৌভাগ্যবান বাদশাহ ছিলেন। তিনি স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং এ কাজের জন্য মনোনিত হন।

কাহিনী নং- ৫৬৬

বিধবার গাভী

সুলতান মালিক শাহ সলজুতী একবার ইস্পাহানের জংগলে বিনোদন মূলক শিকারে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে নিকটস্থ একটি গ্রামে অবস্থান করতে হয়েছিল। রাজ কর্মচারীরা সেখানে একটি মোটা তাজা গাভী দেখলো এবং বেওয়ারিশ ভেবে জবেহ করে কাবাব বানিয়ে সবাই তৃপ্তি করে খেল। গাভীটি ছিল এক গরীব বিধবার, যার অল্প বয়স্ক তিনটি ছেলে এ গাভীর দুধের দ্বারা পালিত হতো। বিধবা যখন এ খবর পেল, পর দিন খুব ভোরে ইস্পাহানের নিকটস্থ সন রোড ব্রিজের উপর এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষনের মধ্যে সুলতানের কাফেলাও এসে ব্রিজ অতিক্রম করছিল। যে মাত্র সুলতানের ঘোড়া বিধবার নজরে পড়লো, সে এগিয়ে গিয়ে নির্ভিক ভাবে সুলতানকে সম্বোধন করে বললো- ওহে রাজপুত্র! তুমি কি আমার অভিযোগের বিচার সনরোডের পুলের উপর করবে, নাকি কিয়ামতের পুলসিরাতে করবে? এ দু' জায়গার যেটা মন:পূত হয়, সেটা গ্রহণ কর।

খোদাভীরু সুলতান বিধবার এ উক্তি শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে বললেন- বোন, পুলসিরাতে বিচার করার সাহস আমার নেই। আমি তোমার অভিযোগের বিচার এ পুলের উপর করতে প্রস্তুত আছি। তুমি কাছে এসে তোমার কি অভিযোগ খুলে বল। বিধবা সুলতানের সামনে এগিয়ে গিয়ে স্বীয় গাভীর সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। সুলতান সব কথা শুনে বললেন- তুমি যদি রাজি হও, আমি তোমার গাভীর বদলে সত্তরটি গাভী দিতে প্রস্তুত আছি।

বিধবার আর কি বলার আছে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি প্রকাশ করলো। সুলতান ওকে সন্তুষ্ট করে ওখান থেকে চলে আসলেন। (তারীখে ইসলাম- ১৩৪ পৃঃ)

সবক ঃ রোজ হাশরের বিচারের ব্যাপারে ভয় থাকা উচিত। ঐ দিন প্রত্যেক কিছুর জবাবদিহি করতে হবে। ঐ ব্যক্তি বড় হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান, যে কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহিতা থেকে বাচার জন্য এখানে আত্মরক্ষা মূলক সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এবং মজলুমদের সাথে আপোষ রফা করে নিজের পরিনামকে ভাল করে নেয়।

কাহিনী নং- ৫৬৭
আলমগীরী বিচার

বাদশাহ আলমগীর এক রাত্রে আগ্রার দূর্গে আরাম করছিলেন। এমন সময় কোন এক ফরিয়াদী শাহী মহলে লটকানো শিকল নাড়ালো। এ শিকল লটকানো হয়েছিল যে কোন ফরিয়াদী বাদশাহের দরবারে কোন ফরিয়াদ শুনাতে চাইলে যেন শিকলটা নাড়া দেয়, যাতে বাদশাহ বুঝতে পারেন যে কোন ফরিয়াদী ফরিয়াদ শুনাতে এসেছে। শিকল নাড়ার সাথে সাথে বাদশাহ বিছানা থেকে উঠে শাহী দরবারে আসলেন এবং ফরিয়াদীকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধাকে হাজির করা হলো। বৃদ্ধা যথাযথ সম্মান পূর্বক আরয করলো- হুযুর! আমি রাম নগর (আগ্রা থেকে পনের মাইল দূরে) থেকে এসেছি। আমার এক যুবতী মেয়ে আছে, যার বিবাহ ঠিক হয়েছে আমার এক আত্মীয়ের সাথে। গ্রামের জমিদারের লম্পট ছেলে আমার মেয়েকে বিবাহ করতে চায় কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি। কিন্তু সে এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমার মেয়েকে জোর জবরদস্তি করে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আমি হলাম বিধবা ও গরীব আর সে হলো জমিদার। আমার বাধা দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। বাদশাহ আলমগীর বললেন, ভয় কর না, এর ব্যবস্থা করা হবে। বৃদ্ধা বললো- আমি খবর পেয়েছি যে আজ রাত্রে সে সাঙ্গপাঙ্গসহ এসে জোর জবর দস্তি আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি এ দিকে ছুটে এসেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে এ রকম কিছু একটা ঘটাবে। খুবই কষ্ট করে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আগামী কাল বা পরে কিছু একটা করলে, কোন কাজে আসবে না। যা করার আছে, এ মুহূর্তে করতে হবে। নচেৎ আমার মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাদশাহ তক্ষুনি দুটি ঘোড়া হাজির করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং বৃদ্ধা থেকে কয়েকটি বিষয় জেনে নিয়ে তিনি ও উজীরে আযম বর্ম পরিধান করে ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত বেগে রাম নগর রওয়ানা হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা রাম নগরের কাছাকাছি পৌছে গেলেন। গ্রামে প্রবেশ করতেই ঘন বৃক্ষরাজির আড়াল থেকে কিছু মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন। উভয়ে ঘোড়া থেকে নেমে খুবই সতর্কতার সাথে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা

শুনতে পেলেন ঃ

পুরুষ কণ্ঠ - দেখ জেদি মেয়ে! কেন প্রান হারাতে চাচ্ছ? এখনও সময় আছে চিন্তা করে দেখ।

মহিলা কণ্ঠ - ইজ্জতের ছদকা হচ্ছে প্রান। আমার কাছে প্রানের কোন মূল্য নেই।

পুরুষ কণ্ঠ - আমি হলাম নও জোয়ান, জমিদার ও সম্পদশালী। তা ছাড়া সুদর্শনও। তবুও অগ্রাহ্যের হেতু কি?

মহিলা কণ্ঠ - কোন হেতু নেই। তবে আমার মাতাজী আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি মাতাজীর আমানত।

পুরুষ কণ্ঠ - আমি তোমাকে প্রানে মেরে ফেলবো।

মহিলা কণ্ঠ - যা পরমেশ্বরের মর্জি।

পুরুষ কণ্ঠ - 'বাদা সিং, অমর সিং, তোরা কোথায়?' এ আওয়াজ শুনা মাত্র এ দিক সে দিক থেকে অনেক যুবক বের হয়ে আসলো এবং নির্দেশ পেয়ে ওর উপর হামলা করে বসলো। বাদশাহ আলমগীর আর দেরী না করে তলোয়ার বের করে ওদের সামনে গেলেন এবং বজ্রপাতের মত গর্জিয়ে উঠে বললেন, খবরদার! অতপর বাদশাহ ও উজীর উভয়ে ওসব বদমাইশদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জমিদারের গুন্ডারা বাদশাহকে মহিলার বাগদত্তা মনে করে জান প্রাণ দিয়ে মুকাবিলা করলো। গ্রাম্য হাতিয়ার ও লাঠির আঘাতে বাদশাহ ও উজীর সামান্য আহত হল কিন্তু ইকবাল শাহী ও ইস্পাহানী তলোয়ারের সামনে ওরা টিকে থাকতে পারলো না। তলোয়ারের আঘাতে কয়েক জন মারা গেল, কয়েক জনের হাত কেটে গেল আর বাকীরা পালিয়ে জান বাচঁলো।

এ দৃশ্য দেখে মেয়েটি বেঁহুশ হয়ে গেল। বাদশাহ ওকে নিজ ঘোড়ায় উঠিয়ে উজিরসহ ফিরে আসলেন। ঘড়িয়াল তখন রাত ২টার ঘন্টা বাজাচ্ছিল, যখন তাঁরা আগ্রার কিল্লায় প্রবেশ করছিলেন। মেয়ের মাকে ডেকে মেয়েকে হস্তান্তর করলেন এবং শাহী হেকীম ও শৈল্য চিকিৎসক ডেকে এনে উজীরের যাথাযত চিকিৎসার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের আঘাতের ব্যাপারে বললেন, এ গুলো 'অনায়াসে সেরে যাবে, কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই'।

পর দিন সকালে বাদশাহ রাম নগরের আহত ও পলাতক সবাইকে হাজির করার জন্য কোতয়ালকে নির্দেশ দিলেন। দুপুরের আগেই সেই জমিদার পুত্র সহ সবাইকে হাজির করা হলো। বাদশাহ ওদেরকে বললেন- তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ও আমার উজীরের কোন আক্রোশ নেই। আমরা তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। তবে এ বৃদ্ধা মহিলা ও ওর মেয়ের উপর যে জুলুম হয়েছে, সেটার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বাদশাহ বৃদ্ধা মহিলাকে রাজভান্ডার থেকে পাঁচশ সোনার মোহর দিয়ে বিদায় করলেন এবং মেয়ের যখন বিবাহ হয়েছিল, তখন সে বিবাহ অনুষ্ঠানেও বাদশাহ যোগদান করেছিলেন। (ইয়াদে মাজি- ১১৯ পৃঃ)

সবক ঃ বাদশাহ আলমগীর খোদাভীরু, ন্যায় পরায়ন ও গরীব দরদী ছিলেন। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মজলুমদের সহায়তা করতেন। তিনি প্রজাদের খবরা খবর ও সুখ শান্তির জন্য নিজের আরামকে হারাম মনে করতেন। এ রকম চরিত্রবান, ন্যায় পরায়ন ও বাহাদুর বাদশাহ মোঘল সাম্রাজ্যে আর দেখা যায় নি।

কাহিনী নং- ৫৬৮

বাদশাহ আলমগীর ও এক বহুরূপী

এক বহুরূপী বাদশাহ আলমগীরকে নানা ভাবে ধোকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ধোকা দিতে পারেনি। বাদশাহ ওকে বলেছেন, তুমি যদি আমাকে ধোকা দিতে পার, তাহলে তুমি যা চাও, তা পাবে। সে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু বারবার বিফল হলো। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দিন পর দরবেশের ছদ্মবেশ ধারন করে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। রাত দিন ইবাদতের মধ্যে মশগুল রইলো। প্রথম প্রথম এ খবর আশে পাশের এলাকায় পৌঁছে এবং স্থানীয় লোকেরা ওর কাছে আসা যাওয়া করতে লাগলো। অতঃপর এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লো। আমীর ওমরা সবাই ওর আস্তানায় ধর্না দিতে লাগলো। পয্যায়ক্রমে এ খবর বাদশাহের কানে পৌঁছলো। আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি বাদশাহের বিশেষ মহব্বত ছিল। এক দিন তিনিও তশরীফ নিয়ে গেলেন। দূর থেকে বাদশাহকে দেখে বহুরূপী লোকটি তাড়াতাড়ি মাথা নোয়ায়ে মুরাকিবায় মশগুল হয়ে গেল। বাদশাহ পাশে দাড়িয়ে রইলেন। দীর্ঘক্ষন পর মাথা উঠালো এবং বাদশাহকে বসার জন্য ইশারা করলো।

বাদশাহ আদব সহকারে ওর পাশে বসলেন। বাদশাহ বসা মাত্র সে দাঁড়িয়ে সালাম করে বললো- জাঁহাপনা! আমি অমুক বহুরূপী। বাদশাহ লজ্জিত হলেন এবং বললেন- বাস্তবিকই এবার আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। ঠিক আছে, তুমি যা ইচ্ছে চাইতে পার। সে বললো- এখন আপনার কাছে আমার চাওয়ার কিছু নেই। আমি ভণ্ডামী স্বরূপ আল্লাহর নাম জপ করছিলাম। যার প্রতিক্রিয়ায় আপনার মত মহা সম্মানিত বাদশাহ আমার দরজায় এসে ধর্না দিয়েছেন। যদি আমি সত্যিকার ভাবে তাঁর নাম জপ করি, তাহলে কি অবস্থা হবে- এ বলে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। (মলফুজাতে আলা হযরত - ৬০ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর জিকির বড় বরকতময়। এ বরকতের কারণে আল্লাহর জিকির কারীদের দুয়ারে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা ধর্না দিয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ৫৬৯

স্বর্ণ মুদ্রার থলি

এক ব্যবসায়ী সুলতান মাহমুদ গজনবীর কাছে অভিযোগ করলো- আমি দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রার একটি মুখবন্ধ থলি কাজী সাহেবের কাছে আমানত রেখে সফরে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে আমাদের কাফেলায় ডাকাতি হয় এবং আমার সব জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। কাজী সাহেব থেকে আমার থলিটা ফেরত নিয়ে খুলে দেখি সেটাও এক প্রকার লুট হয়ে গেছে। সেখানে স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে সাধারণ মুদ্রা ভরে রাখা হয়েছে। সুলতান মাহমুদ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজী সাহেবকে এ ব্যাপারে বলনি?

ব্যবসায়ী বললেন, জাঁহাপনা! হ্যাঁ আমি ওনাকে বলেছি। তিনি বলেছেন, তুমি আমাকে যে রকম মুখবন্ধ থলি দিয়েছ, আমি তোমাকে সে রকম অবিকল মুখবন্ধ থলি ফেরত দিয়েছি এবং তুমি নিজেই তা সনাক্ত করেছ এবং বলেছ যে থলি ঠিকই আছে। মাহমুদ জানতে চাইলেন, থলি কি যথাযথ অবস্থায় ছিল?

ব্যবসায়ী বললেন, জাঁহাপনা! হ্যাঁ, থলি একেবারে যথাযথ অবস্থায় ছিল।

মাহমুদ বললেন, এটাতো বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি দেখি, কি করতে পারি।

ব্যবসায়ী চলে যাওয়ার পর সুলতান থলিটির চারিদিকে দেখলেন। কিন্তু কোন

ছিঁড়া ফাটা দৃষ্টিগোচর হলো না। তবুও সুলতানের মনে এ ধারনাটা বদ্ধমূল হলো যে এ থলিটি নিশ্চয়ই ছেঁড়া হয়েছে এবং সেটা থেকে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো বের করে মামুলী মুদ্রা ভরে দক্ষ রিপুকার দ্বারা রিপু করা হয়েছে। এখন এটা জানা দরকার যে শহরে এমন রিপুকার কে আছে, যার রিপুতে আসল নকল বুঝা যায় না। সুলতান যে সময় থলির ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন সে সময় তিনি একটি মূল্যবান নতুন কার্পেটের উপর বসা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি আসলো। তিনি একটি ছুরি বের করে কার্পেটটি কেটে দিলেন এবং এর পরপরই তিন দিনের জন্য শিকারে চলে গেলেন।

সুলতান চলে যাওয়ার পর কার্পেট পরিচর্যাকারী তাঁর কামরায় ঢুকে দেখে যে সুলতানের কার্পেটটি ছেঁড়া। সে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীকে খবর দেয় এবং শাহী মহলের সমস্ত কর্মচারী চারিদিক থেকে ছুটে আসে। কার্পেট পরিচর্যাকারী ভয়ে কাঁপছিল। এক বৃদ্ধ লোক ওকে বললো, দোস্ত! তুমি ভয় করো না। তুমি এখনই আহমদ রিপুকারের কাছে যাও। সে এমনভাবে রিপু করে দিবে যে সুলতান শতবার দেখলেও বুঝতে পারবে না। কার্পেট পরিচর্যাকারী তখনই কার্পেট উঠায়ে রিপুকারের কাছে নিয়ে গেলেন।

আহমদ রিপুকার বললো, এর জন্য আমাকে দুই স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হবে। কার্পেট পরিচর্যকারী বললো চার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে রাজি আছি। তবে তিন দিনের মধ্যে করে দিতে হবে যাতে সুলতান ফিরে আসার আগে শাহী সিংহাসনে বিছিয়ে দেয়া যায়। এটার সাথে আমার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সুলতান যদি এর কোন খুত ধরতে পারে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই হবে আমার শাস্তি।

আহমদ রিপুকার ওকে আশ্বস্ত করে বললো- দোস্ত, ভয় করোনা। আহমদ রিপুকারের খুত ধরার মত লোক আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। অতঃপর সে দু দিনের মধ্যে রিপু করে দিল। এমন সুন্দর ভাবে রিপু করে দিল যে ছেঁড়ার কোন চিহ্ন রইলো না। কার্পেট পরিচর্যাকারী ওকে ধন্যবাদ দিল এবং সুলতান ফিরে আসার আগে পূর্ণ আস্থা নিয়ে যথাস্থানে বিছিয়ে দিল।

সুলতান মাহমুদ শিকার থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর কার্পেটের সেই ছেঁড়া অংশটা গায়েব হয়ে গেছে। তিনি কয়েকবার গভীর ভাবে দেখলেন কিন্তু কোথাও ছেড়ার কোন হদিস পেলেন না।

সুলতান কার্পেট পরিচর্যাকারীকে ডেকে বললেন, এ কার্পেট ছেঁড়া ছিল। কিন্তু এখন চোখে পড়ছে না। কার্পেট পরিচর্যাকারী বললো- কৈ, এটাতো মোটেই ছেঁড়া ছিল না। সুলতান বললেন, মিথ্যুক, আমি নিজেই ছুরি দিয়ে কেটে ছিলাম। এ কথা শুনে কার্পেট পরিচর্যাকারী ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সুলতান বললেন, ভয় কর না, যে এটা রিপু করেছে, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। নির্দেশ মত আহমদ রিপুকারকে দরবারে হাজির করা হলো। সুলতান ওকে জিজ্ঞেস করলেন- এটা তুমি রিপু করেছ? সে বললো- হ্যাঁ। সুলতান ওকে ধন্যবাদ জানালেন। অতঃপর সুলতান সেই থলিটি বের করে রিপুকার আহমদকে দেখায়ে জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি তুমি রিপু করেছ? সে বললো, হ্যাঁ, এটা কাজী সাহেব আমার দ্বারা রিপু করিয়েছিলেন। সুলতান কাজী সাহেবকে দরবারে তলব করে রাগান্বিত হয়ে বললেন- হে জালিম! তোমার চুলতো সাদা হয়ে গেছে। আমি এ শহরের বিচার কার্য তোমার উপর সোপর্দ করেছিলাম এবং জনগনের জান-মালের হেফাজতকারী বানিয়ে ছিলাম। কিন্তু হেফাজত কারীর নাম ভাঙ্গিয়ে খেয়ানতকারী হলে। এটাই কি আমার আস্থার প্রতিদান?

কাজী জোর গলায় বললেন- জাঁহাপনা, খেয়ানতের অভিযোগ থেকে আমি পবিত্র। সুলতানের আস্থাকে আমি কখনো কলুষিত করিনি। আমার বিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে।

সুলতান থলিটি দেখিয়ে বললেন- এখান থেকে তুমি স্বর্ণ মুদ্রাগুলো বের করে সাধারণ মুদ্রা ভরে দিয়ে আমানতদারকে কি প্রতারিত করনি? কাজী সাহেব বললেন- জাঁহাপনা, আমি এ থলিটা এর আগে কখনো দেখিনি, এখন দেখতেছি।

সুলতান ব্যবসায়ী ও রিপুকারকে ডাকলেন। ওদেরকে দেখে কাজী সাহেব হতভম্ভ হয়ে গেছেন এবং আপাদমস্তক কাঁপতে লাগলেন। তিনি সুলতানের কাছে কয়েকবার মাফ চাইতে চেষ্টা করলেন কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। সুলতান নির্দেশ দিলেন- ওনাকে বন্দি কর। এ নির্দেশের কথা শুনার সাথে সাথে কাজী সাহেব বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

এ অবস্থা দেখে সুলতান ওকে বন্দি না করে দরবার থেকে বের করে দিলেন এবং ব্যবসায়ীকে নিজ থেকে দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিলেন। দরবার থেকে বের হওয়ার সময় কাজীর চেহারা ছিল খুবই কালো এবং সমস্ত শরীফ ঘামে ভিজে

গিয়েছিল এবং হাত-পা কাঁপছিল। লোকেরা ওনাকে ধিককার দিচ্ছিল। এতে তিনি খুবই আপমান বোধ করলেন। ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন, কারো সাথে কোন কথা বললেন না। রাত্রে পরিবারের লোকেরা দানা পানি কিছু খাওয়ানোর খুবই চেষ্টা করলো। কিন্তু এক ফোটা পানিও পান করানো সম্ভব হলো না। সকালে পরিবারের লোকেরা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে কাজী সাহেব বিচানায় মৃত পড়ে রয়েছেন। (সংগ্রহ)

সবক ঃ আগের যুগের অনেক রাজা-বাদশাহ বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতেন। যেমন অপরাধী হোক না কেন, তাঁদের হাত থেকে সহজে রেহাই পেতনা। আজকালকার শাসক বর্গের দুর্বলতার কারণে অনেক জঘন্য অপরাধীও ছাড় পেয়ে যায়। যার ফলে সমাজে খুন-খারাবী, চুরি, ডাকাতি লেগেই আছে। এ নরক যন্ত্রনা থেকে বাচাঁর জন্য সুলতান মাহমুদের মত শাসক প্রয়োজন।

কাহিনী নং- ৫৭০

খুরাসানের শাসক

খুরাসানের শাসক ইসমাইল বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন- আমি এক দিন সমরসন্দে দরবারী মামলা মুকাদ্দমা শুনানীতে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ শেখুল ইসলাম, আলেমে রব্বানী হযরত মুহাম্মদ বিন নছর মরুজী তথায় তশরীফ আনেন। আমি ওনাকে দেখে সন্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ইজ্জত করে নিজের পাশে বসালাম। ওনি কিছু কথাবার্তা বলে যখন চলে গেলেন, তখন আমার ভাই ইসহাক আমাকে বললো–

তুমি প্রজাদের কারো কারো জন্য দাঁড়িয়ে যাও- تقوم لرجل من الرعية। অর্থাৎ সে এটাই বুঝাতে চেয়েছে যে প্রজাদের জন্য এ ভাবে দাঁড়ানো শাহী মান-মর্যাদার খেলাপ। খুরাসানের শাসক বলেন- সে রাতেই আমি স্বপ্ন দেখলাম যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে তশরীফ এনেছেন এবং আমার বাহু ধরে ফরমালেন- تبت ملكك وملك بنيك باجلالك محمد بن نصر অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন নছরকে ইজ্জত-সম্মান করার কারণে তোমার ও তোমার বংশের রাজত্ব স্থায়ী করে দেয়া হলো এবং তোমার ভাই

ইসহাকের রাজ্য অতি সহসা হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। কেননা সে মুহাম্মদ বিন নছরের প্রতি অবজ্ঞা করেছে। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২০৩ পৃঃ)

সবক ঃ হক্কানী ওলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি ইজ্জত-সম্মানের দ্বারা আল্লাহ-রসূলের রেজামন্দি হাসিল হয়। যে কোন কামিল ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েজ বরং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সন্তুষ্টি লাভের সহায়ক। স্বয়ং হুযূরের তাজীম-তকরীমের জন্য কিয়াম করলে নিশ্চয়ই হুযূর সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহও খুশী হবেন। এ কাহিনী দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে আমাদের প্রতিটি কাজ কর্ম এখনো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জানা হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৫৭১

সিকান্দর বাদশাহ ও চীনের শাহজাদী

সেকান্দর বাদশাহ বিভিন্ন দেশ জয় করে চীনে পৌছার আগে ভাগে চীনের শাহজাদী তাঁর ফটো সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, যার কারণে শাহজাদী বাদশাহকে চিনতেন। সেকান্দর বাদশাহ সৈন্যদেরকে শহরের বাইরে রেখে নিজে পোষাক পরিবর্তন করে ফকীরের বেশ ধারন করে শহরে প্রবেশ করলেন এবং শাহী মহলের কাছে গেলে শাহজাদী তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন এবং নির্দেশ দিলেন- এ ফকীরকে গ্রেপ্তার করে তিন দিন দানা পানিবিহীন অবস্থায় জেলখানায় বন্দি করে রাখ। সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশ পালন করা হলো। চতুর্থ দিন শাহজাদী সেকান্দরকে জেলখানা থেকে বের করে এনে তাঁর সামনে বসিয়ে লাখ লাখ টাকা মূল্যের মনি মুক্তা ওনার সামনে রেখে বললেন- এ গুলো নিয়ে নিন। কিন্তু সেকান্দর ক্ষুধার তাড়নায় সে দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। এরপর একটি যবের রুটি ওনার সামনে রাখলেন। তিনি সানন্দে সেটা খেয়ে পানি পান করলেন। তখন শাহজাদী ওনাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বাদশাহ! এত মূল্যবান মনি মুক্তার প্রতি আপনি দৃষ্টিপাত করলেন না, এ গুলো আপনার কাছে মূল্যহীন মনে হলো। অথচ আপনি এ মূল্যহীন জিনিসের জন্য বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কথা শুনার পর বাদশাহ সেকান্দর চীন থেকে সৈন্য বাহিনী ফিরিয়ে নিলেন। (সীরাতুস সালেহীন)

সবক ঃ কারাগারের মাত্র তিন দিনের কষ্টে লাখ লাখ টাকা মূল্যের মনি মুক্তা

মূল্যহীন হয়ে গেল। একটি মাত্র যবের রুটিই কাজে আসলো। অনুরূপ কবরের কয়েদ খানায়ও দুনিয়াবী কোন ধন সম্পদ কাজে আসবে না। ওখানে একমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে।

کہا احباب نے یہ دفن کے وقت–

کہ ہم کیو نکر وہاں کا حال جانیں

لحدتك آپ کی تعظیم کردی –

اپ اگے اپ کے اعمال جانیں

অর্থাৎ আমরা বন্ধু বান্ধবদের দায়িত্ব হলো কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এর পরের খবর আমাদের নেই, ওনার আমলই জানে।

কাহিনী নং- ৫৭২

সিকান্দর বাদশাহ ও ডাকাত সরদার

একবার এক দুর্দর্ষ ডাকাত সরদারকে ধরে বাদশাহ সিকান্দরের সামনে হাজির করা হয়, যার লুটতরাজে মানুষ সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। একে অনেক কষ্ট করে ধরা হয়েছিল। বাদশাহের সাথে ওর নিম্নবর্ণিত হৃদয়গ্রাহী বাদানুবাদ হলো ঃ

সেকান্দর ঃ তুমি কি তাহরীসের সেই কুখ্যাত ডাকাত, যার লুঠতরাজের কথা দেশব্যাপী সবের মুখে মুখে?

ডাকাত ঃ আমি তাহরীসের বাসিন্দা এবং একজন সৈনিক।

সেকান্দর ঃ না, না; তুমি চোর, লুণ্ঠনকারী, ডাকাত ও খুনী এবং দেশের জন্য অভিশাপ। আমি তোমার সাহসিকতার প্রশংসা করি। তবে তোমাকে ঘৃনা করি এবং তোমার অপরাধের সাজাও প্রদান করবো।

ডাকাত ঃ আমি এমন কি অপরাধ করলাম?

সেকান্দর ঃ তুমি কি দেশের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাও নি? আমার প্রজাদের জান মাল ক্ষতির জন্য সারাজীবন কি অতিবাহিত করনি?

ডাকাত ঃ বাদশাহ মহারাজ! এ সময় আমি আপনার কয়েদী। আপনি যা

বলবেন এবং যা সাজা দিবেন, তা মানতে বাধ্য। তবে আমার আত্মার উপর আপনার কোন কর্তৃত্ব নেই। আপনার কথার উত্তর দিতে হলে একজন স্বাধীন ব্যক্তির মত উত্তর দিতে হবে।

সেকান্দর ঃ তোমার যা বলার আছে, স্বাধীন ভাবে বলতে পার। আমি এ রকম নই যে স্বীয় ক্ষমতা বলে কারো বাক স্বাধীনতা খর্ব করি।

ডাকাত ঃ আমি আপনার কথার জবাব দেয়ার আগে জানতে চাই যে আপনার জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করেছেন?

সেকান্দর ঃ এক বাহাদুর ব্যক্তির মত অতিবাহিত করেছি। জনমত যাচাই করে দেখলে জানতে পারবে যে আমি বাহাদুরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর, ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচে সফলকাম ব্যবসায়ী এবং বিজয়কারীদের মধ্যে সবচে শক্তি শালী বিশ্ব বিজয়কারী।

ডাকাত ঃ এ রকম সুখ্যাতি আমার বেলায়ও আছে। এমন কোন সেনাপতি আছে কি, যে আমার চেয়ে বাহাদুর এবং যার কাছে আমার বাহিনী থেকে সাহসী বাহিনী রয়েছে? কোন সময় কি (এতটুকু বলার পর থমকে গেল, পুনরায় বললো) অহংকারী রাজা বাদশাহের প্রতি আমার ঘৃনা হয়েছে। আপনি নিজেই জানেন, আমি সহজে আপনার কব্জায় আসিনি।

সেকান্দর ঃ তোমার কথা ঠিক আছে। তবে তুমি ডাকাত। তুমি একজন কুখ্যাত ডাকাত হিসেবে পরিচিত।

ডাকাত ঃ আপনি কি সত্যিকার বিজয়ী? আপনি কি বালা-মসিবতের মত পৃথিবীর এ দিক সে দিক আঘাত হানছেন না? আপনি কি মানুষের আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেন নি? আপনি কি নিজের সম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা মিটানোর জন্য অন্যায় ও বেআইনী ভাবে সারা বিশ্বে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালান নি? যে কাজ আমি একশ সহযোগী নিয়ে মাত্র একটি জিলায় করেছি, সে কাজ আপনি লাখো সহযোগী নিয়ে সারা বিশ্বে করেছেন। আমি তো মামুলি মানুষের সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছি। কিন্তু আপনিতো অনেক রাজা-বাদশাহের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন। আমি হাতেগোনা কয়েকটি ঘর জ্বালিয়েছি আর আপনি অনেক উন্নত রাজ্য, শহর, বন্দর ধ্বংস করেছেন। তাই আপনি ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতেছিনা। শুধু এটাই পার্থক্য যে আপনি একজন বাদশাহের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন আর

আমি একজন সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। এ জন্য আপনি আমার থেকে অনেক শক্তিশালী ডাকাত হয়েছেন।

সেকান্দর ঃ তোমার চিন্তাধারা ভুল। তোমার ও আমার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি বাদশাহের মত নিয়েছি এবং বাদশাহের মত দিয়েছি। আমি অনেক রাজ্য ধ্বংস করলেও এর স্থলে অনেক উন্নত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রসার ঘটিয়েছি।

ডাকাত ঃ আমিও যা কিছু ধনীদের থেকে নিয়েছি গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি। আমি জালিমদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছি এবং মজলুমদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়েছি। যে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা আপনি বলেছেন, তা আমি জানি না। তবে এতটুকু জানি যে মানব জাতির যে ক্ষতি আপনি ও আমি করেছি, সেটা কারো পক্ষে পূরন করা সম্ভব নয়।

সেকান্দর ঃ আমরা কি পরস্পর এরকম সমতুল্য? বাদশাহ ও ডাকাত উভয় কি একই বরাবর? তোমার কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। আমি একটু চিন্তা করে দেখি। অতঃপর বাদশাহ শাহী কর্মচারীদেরকে বললো- ওর বাধন খুলে দাও এবং ওর সাথে ভাল আচরন কর। (সংগ্রহ)

সবক ঃ যে সব শাসক সন্ত্রাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত, ওদের ও ডাকাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কাহিনী নং- ৫৭৩

সুলতান মাহমুদ ও এক হিংসুটে

একদিন সুলতান মাহমুদের কাছে তাঁর গোলাম আয়ায সম্পর্কে এক পরনিন্দাকারী অভিযোগ করলো- আয়ায বড় ধোকাবাজ, ওর থেকে সদা সজাগ থাকা উচিত। বাহ্যিক ভাবে সে আপনার জন্য জান কুরবান কিন্তু ভিতরে সে বড় কপট। আমি লক্ষ্য করেছি যে আপনার মহলের পূর্ব দিকে যে কামরাটি আছে, সে প্রতিরাতে যে কামরায় যাতায়াত করে। সে কাউকে সে কামরায় নিয়ে যায় না এবং সেটা সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে সে ধারনাতীত মূল্যবান কিছু চুরি করে সঞ্চয় করছে।

সুলতান মাহমুদ এ কথা শুনে আশ্চর্য হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নিরাপত্তা

রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন- এ মূহুর্তে গিয়ে সেই কামরার তালা ভেঙ্গে তল্লাসী চালাও এবং যা পাও আমার সামনে নিয়ে এসো। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত কামরার তালা ভেঙ্গে ব্যাপক তল্লাসী চালানো হলো কিন্তু সেখানে একটি তালাবদ্ধ সুটকেস ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। সেই সুটকেসটা বাদশাহের সামনে নিয়ে আসা হলো। উৎসুক আমীর ওমরা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দরবারে জমায়েত হলো। সুলতানের নির্দেশে সুটকেস খোলা হলে সেটার মধ্যে দেখা গেল একটা ছেঁড়া কম্বল, একটি ময়লা যুক্ত পুরানো জুব্বা ও একজোড়া পুরানো ছেঁড়া জুতা। সুলতান হতবাক হয়ে আয়াযকে জিজ্ঞেস করলেন- এর রহস্য কি? আয়ায হাত জোড় করে বললো- হুযূর, এ গুলো আমার ব্যবহৃত সে দিনকার ছেঁড়া কাপড় চোপড়, যে দিন বাড়ী থেকে আপনার দরবারে এসেছিলাম। আমি এ গুলো প্রতিদিন একবার করে দেখি, যেন আমি আমার পুর্বাবস্থার কথা ভুলে না যাই এবং এ গুলো দেখে আপনার সহানুভূতির কথা স্বরণ করি। এ কথা শুনে হিংসুটেরা সব নিশ্চুপ হয়ে গেল। (দর-মনজুম- ১২২ পৃঃ)

সবক ঃ অপরের ইজ্জত-সম্মান দেখে হিংসা করা মোটেই উচিত নয়। বরং নিজেকে সে রকম ভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অপরের ক্ষতির চিন্তা করা মোটেই উচিত নয়। এতে নিজের নেকীর ক্ষয় হয়।

কাহিনী নং- ৫৭৪

কাবুলের বাদশাহ আবদুর রহমানের একটি রায়

পেশোয়ারের দুই কসাই মাংসের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কাবুল গিয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে তারা ২/৩ হাজার টাকা আয় করে ফেললো এবং সহসা বাড়ী ফেরার মনস্থ করলো। কয়েক দিন পর অর্জিত টাকা গুলো সাথে নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা দিল। জালালাবাদের কাছাকাছি এসে তারা দেখলো যে এক অন্ধ ভিক্ষুক রাস্তার কিনারায় এক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে এ ভাবে হাঁক দিচ্ছিল ঃ

'হায়রে! যুগের বিবর্তন আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, এমন কি আমার দৃষ্টি শক্তিটাও। আহ! কতইনা আনন্দদায়ক হতো, যদি পুনরায় থলিতে টাকা রাখার সুযোগ হতো।'

এ কথাটি বারবার বলছিল। কসাইদ্বয় ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো- ভাই,

তুমি যুগের বিবর্তনের ব্যাপারে এত হতাশ কেন? অন্ধ ভিক্ষুক বললো- আমি এ এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম। আমার অনেক জায়গা জমি ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এখন আমার কিছু নেই, আমার দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে গেছে। আমার একটি বড় আরজু যে এ অসহায় অবস্থায় যদি নিজের না হলেও অন্যের উপার্জিত নগদ টাকা ক্ষনিকের জন্য আমার হাতে রাখতে পারতাম, তাহলে মনকে শান্তি দিতে পারতাম।

ভিক্ষুকের এ কথা শুনে ওরা চিন্তা করলো আমাদের টাকার থলিটি ক্ষনিকের জন্য ওর হাতে দিলে ক্ষতি কি? এতে ওর মনের আশাটা পূর্ণ হবে। তাছাড়া সে একজন অন্ধলোক, যাবে কোথায়? এ ভেবে ওদের টাকার থলিটা ভিক্ষুকের হাতে দিয়ে বললো- ভাই, তোমার আরজু পূর্ণ কর।

ভিক্ষুক টাকার থলি পেয়ে ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কিছুক্ষন পর ওদের মধ্যে একজন বললো- ভাই ভিক্ষুক, এবার আমাদের টাকার থলিটা ফেরত দাও। ভিক্ষুক গম্ভীর ভাবে বললো- থলি! কি থলি? কিসের থলি? ফেরত কিসের? এটা কি কথা? ওদের অন্যজন ভিক্ষুককে বললো, রসিকতা ছাড়, তাড়াতাড়ি টাকার থলিটা ফেরত দাও। আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। কিন্তু ভিক্ষুক থলি ফেরত দিতে কিছুতেই রাজি নয়। কসাইদ্বয় মহা সমস্যায় পড়লো।

ভিক্ষুক বললো- আমি সারা জীবন এখানে অতিবাহিত করেছি এবং এক এক পয়সা করে জমা করেছি। তোমরা কোথা থেকে কুখ্যাত ডাকাত এখানে এসে পৌছেছ এবং আমার সারা জীবনের উপার্জিত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছ।

কশাইদ্বয় ভিক্ষুকের মুখে এ ধরনের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। ভিক্ষুক সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগলো। তারা তাদের টাকার থলি ওর থেকে জোর করে নিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করলে, সে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার শুরু করে। কাছেই ছিল বস্তি। ওখান থেকে লোকেরা দৌড়ে এসে কসাইদ্বয়কে ডাকাত মনে করে ধরে ফেললো। তারা বস্তি বাসীদেরকে বুঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু তাদের কথাকে কেউ মোটেই পাত্তা দিল না। ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে এ ডাকাতদ্বয়কে বাদশাহের দরবারে নিয়ে যাবে এবং এর বিনিময়ে পুরস্কার আদায় করবে। অতঃপর ভিক্ষুকসহ ওরা দুজনকে আমীর আবদুর রহমানের দরবারে হাজির করলো।

আবদুর রহমান সে সময় আদালতের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। দরবারের অন্যান্য লোকেরাও হাজির ছিল। বাদশাহ প্রথমে ভিক্ষুকের বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর কসাইদ্বয়ের মুখে তাদের প্রতি জুলুমের অভিনব কাহিনী শুনলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনার পর বাদশাহ খাদেমকে একটি বড় কড়াই আনার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং সেটায় পানি গরম করার জন্য বললেন। এ নির্দেশ শুনে বেচারা কশাইদ্বয় শিউরে উঠলো, ফুটন্ত পানিতে তাদের মৃত্যুর কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো। যথাসময়ে কড়াই আনা হলো এবং পানি ঢেলে খুব গরম করে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো। বাদশাহ রাগান্বিত স্বরে বললেন- টাকার থলিটা খুলে টাকাগুলো গরম পানিতে ঢেলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তা করা হলো। বাদশাহ এবার সবাইকে কড়াই থেকে দুরে সরে যাবার জন্য বললেন। সবাই দূরে সরে গেলে বাদশাহ বিচারকের আসন থেকে নেমে কড়াই এর কাছে এসে গরম পানির উপরিভাগ ভাল মতে দেখলেন এবং ফিরে এসে নির্দেশ দিলেন- কড়াই এর পানি ফেলে দিয়ে টাকাগুলো উঠিয়ে কসাইদ্বয়কে দিয়ে দাও এবং অন্ধ ভিক্ষুককে যথাযথ শাস্তি প্রদান কর। এ রায় শুনে কসাইদ্বয় যারা একটু আগে শাস্তির ভয়ে কম্পমান ছিল, খুশিতে আটকানা হয়ে গেল। উপস্থিত লোকেরা এ রায় শুনে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা এ নিয়ে পরস্পর আলোচনা সমালোচনা করতে লাগলো। দরবারের কাজী সাহেব সাহস করে বাদশাহের কাছে এ রায়ের ব্যাখ্যা শুনার আগ্রহ প্রকাশ করলে বাদশাহ বললেন, যে দু'ব্যক্তিকে অপরাধী বলা হয়েছে আসলে তারা নিরাপরাধ। তারা সত্যিই মাংস বিক্রি করে টাকাগুলো সংগ্রহ করেছিল। টাকাগুলো গরম পানিতে ঢেলে দেয়ার পর পানির উপরে ভাসমান চর্বির নিদর্শন দেখা গেছে, যা নিঃসন্দেহে ঐ কসাইদ্বয়ের হাতের ময়লা যেটা মাংস বিক্রির সময় টাকাতে লেগেছে। বাদশাহের এ বিচক্ষন রায়ে উপস্থিত সবাই সন্তুষ্ট হলেন। (পয়ামে জিন্দেগী)

সবক ঃ শাসকদের উপরে দেশের কল্যান-অকল্যান অনেকটা নির্ভরশীল। অথর্ব শাসকদের হাতে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনে আর বিচক্ষন শাসকদের হাতে দেশের কল্যান বয়ে আনে।

কাহিনী নং- ৫৭৫

ইসলামী আদালত

বাদশাহ মুরাদজি সতুতের নির্দেশে শাহী রাজমিস্ত্রী একটি মনোরম মসজিদ নির্মান করে। যদিওবা মিস্ত্রী এতে যথেষ্ট মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছে, কিন্তু বাদশাহের পছন্দ হয়নি। বাদশাহ ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওর হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর করা হলো। বাদশাহের এ অমানবিক জুলুমের প্রতিবাদে সে কাজীর দরবারে আর্জি পেশ করলো। কাজী বাদশাহকে তাঁর আদালতে তলব করলেন। বাদশাহ কাজীর আদালতে হাজির হয়ে ইসলামী আইনের সামনে একান্ত ভীত ও নমনীয় হয়ে বললেন- আমি রাগের মাথায় এ কাজ করেছি। বাস্তবিকই আমি অপরাধী। কাজী সাহেব তাঁর রায়ে বলেন- আপনার জন্য কিসাসের হুকুম প্রয়োজ্য, আপনার হাতও কেটে ফেলতে হবে। কুরআনী আইনে রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলামে আপনার রাজ মুকুটের কোন মূল্য নেই। এ রায় শুনে বাদশাহ কেঁদে দিলেন এবং কুরআনী আইনের সামনে মাথানত করে কর্তনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। এটা দেখে বাদী সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন- রক্তপাত আমার কাম্য নয়, আমি বাদশাহকে ক্ষমা করে দিলাম। প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে নয়, ন্যায় বিচারের জন্যই আর্জি পেশ করেছি। আমি যে ন্যায় বিচার পেয়েছি এতেই আমি সন্তুষ্ট। (তারিখে ইসলাম)

সবক ঃ ইসলামী আদালতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। বড় ছোট সবাই সমান। সংঘাতময় এ বিশ্বে একমাত্র ইসলামই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর কোন বিকল্প নেই।

দশম অধ্যায়
বিভিন্ন কাহিনী

কাহিনী নং- ৫৭৬
মৌলুদ শরীফ

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহিম সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সম্পর্কে বলেন- হযরত শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মিলাদুন্নবীর সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বত এবং হুযূরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি বছর খানা পাকাতেন। এক বছর খানা পাকানোর মত সামর্থ ছিল না; মাত্র কিছু ভুনা চানাবুট যোগাড় করতে পেরেছিলেন। তিনি সেই চানাবুটই মিলাদুন্নবীর দিন মিলাদ মাহফিলের পর বন্টন করেন। সেই দিবাগত রাত্রেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সামনে সেই চানাবুট গুলো রাখা হয়েছে এবং হুযূর ভীষন খুশী হয়েছেন, যা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠেছে। (আদ-দুর্রুছ ছমীন)

সবক ঃ প্রতি বছর মিলাদুন্নবী উৎযাপন করা এবং মিলাদুন্নবীর খুশিতে সাধ্য মোতাবিক কিছু বন্টন করা বিদআত নয় বরং অনেক বড় বড় বুজুর্গ ও ওলীগণের আমল। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন আনন্দ প্রকাশে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সন্তুষ্ট হন।

কাহিনী নং- ৫৭৭

শহীদগণ জীবিত

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে কয়েকজন মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে শত্রুদের হাতে বন্দী হয় এবং তাঁদেরকে কাফির বাদশাহের সামনে হাজির করা হয়। কাফির বাদশাহ তাঁদেরকে বললো- ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে এসে যাও। নচেৎ হত্যা করা হবে। মুজাহিদগণ বললেন- জান যেতে পারে, ঈমান যেতে পারে না। যা খুশী করতে পারেন কিন্তু ইসলামের দামান ত্যাগ করা যাবে না। এ কথা শুনার পর জালিম বাদশাহ একজন ব্যতীত সবাইকে শহীদ করে দিল। জীবিত মুজাহিদকে পুনরায় ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করলো এবং নানা রকম প্রলোভন দেখালো। কিন্তু সেই মরদে 'মুজাহিদ ওসব প্রলোভনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ইসলামে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে প্রেরণ করলো এবং তার সাথে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলাও প্রেরণ করলো, যাতে সে তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করে ওনাকে ইসলাম থেকে বিপদগামী করে। কিন্তু সেই মরদে মুজাহিদ ওর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়েন। যখন তিনি مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ তেলাওয়াত করলেন, তখন সে মহিলাটি কেঁদে দিল এবং বললো আমাকে মুসলমান করে নিন। মুসলমান হওয়ার পর সেই মহিলার পরামর্শে উভয়ে রাতের অন্ধকারে জেলখানা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং জালিম বাদশাহের নাগাল থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। ভোর রাত্রে কয়েকটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে তাঁরা ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁরা মনে করলেন যে জালিম বাদশাহ তাঁদেরকে ধরার জন্য লোক পাঠিয়েছে। অশ্বারোহীনগণ কাছে আসলে, তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এরা সেই মুজাহিদগণ, যাদেরকে একদিন আগে জালিম বাদশাহ শহীদ করে দিয়েছিল। ও সব মুজাহিদগণ কাছে এসে বললেন, ভাইজান, আমাদেরকে মৃত মনে কর না, আমরা জীবিত। আমরা এ বোনের ইসলাম গ্রহণে মুবারকবাদ জানাতে এসেছি, এবং এ শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে শীঘ্রই তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। (নুজহাতুল মাজালিস- ১৬৩ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীগণ স্থায়ী জিন্দেগী লাভ করেন।

মুমিন বান্দাগণ ঈমান রক্ষার জন্য জীবন ত্যাগ করতে রাজি কিন্তু জীবন রক্ষার্থে ঈমান ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজি নয়।

কাহিনী নং- ৫৭৮

গরুর বাছুর

বণী ইসরাইলের যুগে এক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহন করে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিল। সাথে ঘোড়ার বাছুরও ছিল। ওর পিছনে আর এক ব্যক্তি গাভীর উপর আরোহন করে আসছিল। গাভী ওয়ালা ঘোড়ার বাছুরটাকে ডাকলে সেটা ওর কাছে চলে যায়। অশ্বারোহী বাছুরটা ওর কাছে ফিরিয়ে নিতে চাইলে গাভী ওয়ালা বাধা দেয় এবং বলে যে এটা আমার গাভীর বাছুর। এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে ভীষন ঝগড়া হলো এবং কোন সুরাহা না হওয়ায় এক বিচারকের আদালতে গেল। গাভী ওয়ালা অশ্বারোহীর অজান্তে বিচারককে মোটা অংকের ঘুষ দেয়ায় বিচারক গাভী ওয়ালার পক্ষে রায় ছিল। অশ্বারোহী এ রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে অপর বিচারকের আদালতে গেল। সেখানেও গাভী ওয়ালা ঘুষ দিয়ে ওর পক্ষে রায় করিয়ে নিল। অশ্বারোহী এ রায় মেনে নিতে কিছুতেই রাজি হল না। পুনরায় তৃতীয় বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা পেশ করলো। তৃতীয় বিচারক উভয়ের বক্তব্য শুনার পর বললো- আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে, সেটা বন্ধ হওয়ার পর রায় দিব। এতে উভয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো পুরুষদের কি ঋতুস্রাব হয়? এর প্রত্যুত্তোরে বিচারক বললো- গাভী যদি অশ্ব সাবক জন্ম দিতে পারে, পুরুষের ঋতুস্রাব কেন হতে পারে না? (নুজাতুল মাজালিস- ৬৬ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ ঘুষের বিনিময়ে অনেক সময় জলজ্যান্ত সত্যের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে।

কাহিনী নং- ৫৭৯

ইনসাফ

হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) একবার আল্লাহর কাছে আরয করেন- হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কিছু নমুনা দেখান। আল্লাহ বললেন- ঠিক আছে, অমুক দিকে যাও, সেখানে আমার ইনসাফের নমুনা দেখতে

পাবে। মূসা আলাইহিস সালাম সেদিকে কিছু দূর যাবার পর এক ঘন বৃক্ষরাজির ঝোপ দেখলেন, যার পাশ দিয়ে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি সেই ঝোপের আড়ালে বসে পড়লেন। একটু পরে এক অশ্বারোহী এসে ঝর্ণা থেকে পানি পান করে চলে গেল। চলে যাবার সময় ভুলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি ফেলে গেল। একটু পরে একটি ছেলে সে পথ দিয়ে যাবার সময় থলিটা দেখতে পেল এবং নিয়ে চলে গেল। ছেলেটি চলে যাবার পর এক অন্ধ ব্যক্তি এসে ঝর্ণায় অযু করতে লাগলো। এ দিকে অশ্বারোহী কিছু দুর যাবার পর থলির কথা স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার দিকে ফিরে আসলো এবং থলি খুজে না পেয়ে অন্ধ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো। অন্ধ লোকটি বললো, আমি কিছু জানি না, আমি কোন থলি পাইনি। এতে অশ্বারোহী খুবই রাগান্বিত হয়ে ওকে খুন করে ফেললো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আড়ালে বসে এ সব ঘটনা দেখছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন এটা কোন্ ধরনের বিচার? তখন আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন- হে মূসা, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, অল্প বয়স্ক ছেলেটি স্বীয় প্রাপ্য পেয়ে গেছে। কেননা অশ্বারোহী সেই ছেলেটির বাপ থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা জুলুম করে নিয়ে ছিল এবং অন্ধলোকটি অশ্বারোহীর পিতাকে বিনা কারনে খুন করেছিল। অতএব প্রত্যেকে নিজ নিজ ন্যায্য প্রাপ্য পেয়ে গেছে। (নুজহাতুল মাজালিস-১০৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কাজে কোন না কোন হিকমত নিহিত থাকে। অনেক কাজের মূল রহস্য আমাদের অজানার কারণে আমাদের কাছে অসংলগ্ন মনে হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাজে কোন অসংলগ্নতা নেই।

কাহিনী নং- ৫৮০

বদলা

কোন এক শহরে এক পানি বহনকারী মজুর প্রতি দিন এক স্বর্ণকারের ঘরে পানি পৌঁছিয়ে দিত। এ ভাবে ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বর্ণকারের স্ত্রী ছিল খুবই সুন্দরী, আবার খুবই নেককারও। এক দিন সেই পানি বহনকারী অসৎ উদ্দেশ্যে স্বর্ণকারের স্ত্রীর হাত ধরে নিজের দিকে টান দিল। মহিলাটি খুবই কষ্ট করে হাতটি ছাড়িয়ে দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর

স্বর্ণকার ঘরে আসলে, ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো- আজ তুমি দোকানে আল্লাহর রেজমন্দির বিপরীত কি কাজ করেছ? স্বর্ণকার বললো- আজ এক মহিলার হাতে চুরি পরানোর সময় ওর সুন্দর বাহু দেখে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওর হাত ধরে নিজের দিকে টান দিয়ে ছিলাম। স্ত্রী বললো, এখন বুঝতে পারলাম, আজ তোমার পানি বহনকারী কেন আমার হাত ধরে টান দিয়েছিল? স্বর্ণকার সমস্ত ঘটনা শুনার পর বললো- আমি খুবই অনুতপ্ত, আমার ভুলের জন্য তওবা করছি এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি। পর দিন, পানি বহনকারী এসে স্বর্ণকারের স্ত্রীর কাছে মাফ চাইতে লাগলো। স্বর্ণকারের স্ত্রী বললো, এতে তোমার কোন দোষ ছিল না। এটাতো আমার স্বামীর দোষের কারণেই হয়েছিল। (রুহুল বয়ান ৯৯ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের অনেক গুনাহের কিছু বদলা এ পৃথিবীতে হয়ে যায়। গুনাহের কালিমা সহজে বিদূরীত হয় না। তাই গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

কাহিনী নং- ৫৮১

বদ-নিয়তের কুফল

এক বাদশাহ ছদ্মবেশে ভ্রমনে বের হলেন। এক গ্রামে গিয়ে এমন এক গাভী দেখলেন, যেটা এক মনের মত দুধ দেয়। এ রকম উন্নতজাতের গাভী দেখে বাদশাহের নিয়ত খারাপ হয়ে গেল এবং সেটা নিয়ে আসার জন্য মনস্থ করলেন। পর দিন বাদশাহ সেই উদ্দেশ্যে সেই গ্রামে গেলেন এবং দেখলেন যে গাভীর মালিক দুধ দোহন করতেছে কিন্তু আজ দুধ পেল আগের দিনের অর্ধেক। ছদ্মবেশী বাদশাহ গাভীর মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ দুধ এত কম পাওয়া গেল কেন? গাভীর মালিক উত্তরে বললো- সম্ভবতঃ আমাদের বাদশাহ এ ব্যাপারে কোন জুলুম করার মনস্থ করেছেন। বাদশাহ এ কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলেন এবং সেই গাভী কবজা করার খেয়াল ত্যাগ করলেন। পরদিন থেকে গাভীটি পুনরায় আগের মত দুধ দিতে লাগলো। (নুজহাতুল মাজালিস- ৫ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ জুলুম অত্যাচার কোন সময় সুফল বয়ে আনে না। এর অশুভ পরিনতি দেশের অমঙ্গল ডেকে আনে। তাই সবাইকে জুলম অত্যাচার থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৫৮২

নিয়তের ফল

বাদশাহ নওশিরোয়া একবার শিকারে গিয়ে খুবই তৃষ্ণা বোধ করলেন। তাঁর সাথে পানি না থাকায় নিকটস্থ একটি বাগানে ঢুকলেন এবং বাগানে পাহারারত একটি ছেলেকে দেখে বললেন- আমাকে পানি পান করাও। ছেলেটি বললো- আমার কাছে পানি নেই। বাদশাহ বললো, তাহলে একটি আনার দাও। ছেলেটি গাছ থেকে একটি আনার এনে দিল। আনারটি খুবই মিষ্টি ছিল। বাদশাহ আনারটি খাওয়ার সময় মনে মনে বাগানটি দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আনারটি খেয়ে মজা পেয়ে আর একটি আনারের জন্য বললেন। ছেলেটি আর একটি আনার এনে দিল। বাদশাহ সেটা মুখে দিয়ে দেখলেন যে এটা আগেরটার মত মিষ্টি নয় বরং টক। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি অন্য গাছ থেকে এনেছ? ছেলেটা বললো- না তো, একই গাছ থেকে এনেছি। বাদশাহ বললেন, তাহলে এর স্বাদ কখন থেকে পরিবর্তন হয়ে গেল? ছেলেটি বললো- যখন থেকে বাদশাহের নিয়ত পরিবর্তন হয়েছে। (নুজহাতুল মাজলিস- ৫ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ যেমন নিয়ত, তেমন ফল।

কাহিনী নং- ৫৮৩

সদকার বরকত

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে এক বৃদ্ধা ছিল। সে একবার তিনটি রুটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে পুনরায় আটা নিয়ে রুটি বানাতে বসলো। হঠাৎ ধমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়ে আটাগুলো উড়ায়ে নিয়ে গেল। বৃদ্ধা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ফরিয়াদ নিয়ে গেল এবং বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বাতাসকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- তুমি ওর আটা কেন উড়িয়ে দিয়ে গেলে? বাতাস আরয করলো- মিকাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করুন। মিকাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহকে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর আল্লাহর কাছে জানতে চাইলে আল্লাহ বলেন- হে দাউদ, আমার কোন কাজ নিরর্থক হয় না।

কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী একটি নৌকায় আরোহন করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল। একটি ইঁদুর সেই নৌকার তলায় একটি ছিদ্র করায় সেটা দিয়ে পানি ঢুকে নৌকা ডুবে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। আমি বাতাসকে নির্দেশ দিলাম- যেন আটাগুলো উড়িয়ে সেই নৌকায় ফেলে, যাতে ও সব বিপদ গ্রস্থ লোকেরা সেই আটা দিয়ে নৌকার ছিদ্র বন্ধ করে। তাই করা হয়ে ছিল। ওরা সেই আটা দিয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং নিরাপদে সমুদ্রের কিনারায় পৌছেছিল। হে দাউদ, তুমি ওসব ব্যবসায়ী থেকে ওদের সমস্ত মালের তিনভাগের এক ভাগ নিয়ে সেই বৃদ্ধাকে দিয়ে দাও। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাই করলেন এবং বৃদ্ধা তিনশ হাজার দিনারের সমতুল্য মালামাল পেল। দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন- এ গুলো সেই সদকাকৃত তিন রুটির বরকত। (নুজহাতুল মাজালিস- ১৯২ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর পথে দান করলে বরকত হয় এবং অনেক বিপদ আপদ দূরীভূত হয়।

কাহিনী নং- ৫৮৪

নির্দয় শাসক

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে একটি এলাকার শাসক নিয়োগ করার সময় ওনার থেকে ওয়াদানামা লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। যখন তিনি ওয়াদানামা লিখছিলেন, তখন ওনার ছোট ছেলেটা দৌড়ে এসে হযরত ওমর ফারুকের কোলে বসে পড়ে। হযরত ফারুকে আযম ওকে আদর করতে লাগলেন। ছেলের পিতা তা দেখে বললেন- হুযুর, আমার দশটি সন্তান, কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত কোন সন্তানকে এ ভাবে আদর করিনি। এ কথা শুনে হযরত ওমর ফারুক বললেন, ওয়াদানামা আর লিখার দরকার নেই। সেটা ছিঁড়ে ফেলে দাও এবং বাড়ীতে চলে যাও। যে ব্যক্তির অন্তরে নিজ সন্তানদের প্রতি মহব্বত নেই, সেই ব্যক্তি কি করে প্রজাদের প্রতি দয়া মমতা দেখাবে। এ রকম পাষান হৃদয়ের লোককে আমি শাসক বানাতে পারিনা। (নুজহাতুল মাজালিস- ৫৮ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ শাসকের অন্তরে প্রজাদের প্রতি মায়া মমতা দরকার। নির্দয় শাসক কখনো জনদরদী হয় না।

কাহিনী নং ৫৮৫

সবর

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও চটপটে পাখী ক্রয় করেছিল। সেই পাখীটি যখন খাঁচায় রাখা হলো, তখন আর একটি পাখী কোথেকে উড়ে এসে খাঁচার উপর বসে নিজ ভাষায় কিছু বলে চলে গেল। এর পর থেকে খাঁচার পাখীটি কোন শব্দ করে না, একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। পাখীর পালক এ অবস্থা দেখে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে ফরিয়াদ করলো। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম পাখীসহ খাঁচাটা আনালেন এবং পাখীকে বললেন- তোমার পালক তোমাকে টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে, তোমার উপর ওর হক রয়েছে। তুমি কথা বলা কেন বন্ধ করেছ? পাখী উত্তরে বললো- হুযূর, ওকে বলে দিন, সে যেন আমার আশা ত্যাগ করে। আমি যত দিন খাঁচায় থাকবো, তত দিন কথা বলবো না। তিনি বললেন, কেন? পাখী বললো- যখন আমাকে খাঁচায় বন্দী করা হলো, তখন আমি আমার আস্তানা ও বাচ্চাদের বিরহে কাঁদছিলাম। সে সময় আমার স্বজাতি একটি পাখী এসে আমাকে বললো, কান্নাকাটি ছাড়, নচেৎ সারা জীবন খাঁচায় বন্দী থাকতে হবে। তুমি ধৈর্য ধর ও নিরবতা অবলম্বন কর এতে হয়তো মুক্তি পেয়ে যেতে পার। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম পাখীর এ সব কথা সেই ব্যক্তি কে বললো। সে বললো, হুযূর, তাহলে একে মুক্ত করে দিন, আমি তো একে আনন্দ দানের জন্য ক্রয় করেছিলাম। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম নিজ থেকে পাখীর পালককে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করে পাখীটি ছেড়ে দিলেন। (রুহুল বয়ান ৭৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ বিপদের সময় কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করা উচিৎ নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছায় রেজামন্দি প্রকাশ করে সবর ও ধৈর্য ধারন করা উচিত।

কাহিনী নং- ৫৮৬

তোতা পাখীর বার্তা

এক সওদাগরের কাছে একটি তোতা পাখী ছিল। একবার সওদাগর সাহেব ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান যাবার সময় তোতা পাখীকে জিজ্ঞেস করলো- তোমার জন্য কি আনব? তোতা পাখী বললো- আমার একটি বার্তা নিয়ে যান এবং এর জওয়াব নিয়ে আসবেন। আমার বার্তাটি হলো- আপনি হিন্দুস্থানে গিয়ে যখন কোন বাগানে এক সাথে অনেকগুলো তোতা দেখবেন, তখন ও গুলোকে লক্ষ্য করে আমার পক্ষ থেকে বলবেন- ওহে উন্মুক্ত ময়দানে বিচরণকারী তোতা পাখীরা, ওহে আজাদীর স্বাদগ্রহণকারী তোতাপাখীরা, আমিও তোমাদের ভাই, ভিন দেশে খাঁচায় বন্দী। আমাকে কিছু বলার থাকলে এ সওদাগর সাহেবকে বলতে পার। উনি ফিরে এসে আমাকে বলবে। সওদাগর বললেন, ঠিক আছে আমি তোমার এ বার্তা নিশ্চয় পৌছাবো। অতঃপর সওদাগর সাহেব যখন হিন্দুস্থান গেলেন, তখন ঘটনাক্রমে একটি বাগানে অনেক তোতা পাখী দেখতে পেলেন। সওদাগর সাহেব ও গুলোর কাছে গিয়ে তার তোতা পাখীর বার্তা পৌছিয়ে দিলেন। এ বার্তা শুনে একটি তোতা পাখী গাছ থেকে পড়ে চটপট করে মরে গেল। এ দৃশ্য দেখে সওদাগর সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, এটা হয়তো ওনার তোতা পাখীর প্রেমিক ছিল। দেশে ফিরে তার তোতা পাখীকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এ সব ঘটনা শুনার পর তার তোতা পাখীও খাঁচায় চটপট করে মরে গেল। সওদাগর সাহেব ভীষন আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ব্যাপরটা কিছুই বুঝলেন না। কি আর করা, খাঁচার দরজা খুলে মৃত পাখীটা বের করে বাইরে ফেলে দিলেন। বাইরে ফেলার সাথে সাথে পাখিটি জীবিত হয়ে উঠলো এবং উড়ে গিয়ে গাছের উপর বসলো। সওদাগর সাহেব এ দৃশ্য দেখে আরও অবাক হলেন এবং তোতা পাখীকে লক্ষ্য করে বললেন- আমি যা কিছু দেখলাম, সব আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এখনতো তুমি মুক্ত। এ সব ঘটনার মূল রহস্যটা একটু খুলে বল। তোতা পাখী বললো- হে সওদাগর সাহেব বাস্তবে আমি মারা যাইনি এবং সেই তোতা পাখীটা যেটা আপনি হিন্দুস্থানের বাগানে গাছ থেকে পড়ে মারা যেতে দেখেছিলেন, সেটাও আসলে মারা যায়নি। খাঁচা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাকে ফন্দি

শিখিয়েছিল। অর্থাৎ খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে হলে এ ভাবে মৃত্যুর আগে মৃত্যু বরণ কর। আমি ওর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছি। তাই খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছি। (মছনবী শরীফ- ১৩ পৃঃ)

সবক ঃ দুনিয়াবী ধান্দার খাঁচা থেকে রেহাই পেতে হলে মৃত্যুর আগে মৃত্যু বরণ করতে হবে। সে সব নেককার লোকেরা নফসের কামনাকে মেরে ফেলতে পেরেছে, তাঁরা সত্যিই মুক্ত ও সুখী। আর যাদের নফ্স জীবিত, তারা দুনিয়াবী নানা অশান্তির খাঁচায় আবদ্ধ।

কাহিনী নং- ৫৮৭

বুদ্ধিমানের নীরবতা

হযরত শাবী (রহঃ) এর মজলিসে এমন এক ব্যক্তি আসতেন, যিনি সব সময় নিশ্চুপ রয়ে মজলিসের আলোচনা শুনতেন কিন্তু নিজে কখনো কোন কথা বলতেন না। একবার হযরত শাবী ওকে জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া, তুমি সব সময় নিশ্চুপ থাক, মাঝে মধ্যে তুমিও কিছু বলতে পার। সে বললো, আমি নিশ্চুপ থাকি বিধায় নিরাপদ আছি, শুনতে পারি এবং অনেক কিছু জানতে পারি। কানতো সম্পূর্ণ নিজের আওতাধীন কিন্তু মুখ অনেক সময় লাগামহীন হয়ে যায়। (হায়াতুল হায়ওয়ান- ১১৯ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ বেহুদা বা অধিক কথাবার্তা অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। তাই বেহুদা কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৫৮৮

মূর্খের নীরবতা

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মজলিসে এক ব্যক্তি নিয়মিত আসা যাওয়া করতো এবং সব সময় নিশ্চুপ রয়ে আলোচনা শুনতো কিন্তু নিজে কোন সময় কোন কথা বলতো না। একবার ইমাম আবু ইউসুফ ওকে বললেন, মিয়া, আমি দেখি তুমি নিয়মিত মজলিসে আস কিন্তু সব সময় নিশ্চুপ থাক। মাঝে মধ্যেতো কিছু বলতে পার। সে বললো, আচ্ছা, হুযূর, তাহলে আমি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করি ঃ রোযাদার কোন্ সময় ইফতার করে? ইমাম সাহেব বললেন, যখন

সূর্য ডুবে যায়। সে বললো, যদি সূর্য অর্ধ রাতেও না ডুবে, তখন কি করবে? ইমাম সাহেব হেসে দিলেন এবং বললেন, তোমার নিশ্চুপ থাকাটাই উত্তম ছিল। (হায়াতুল হায়ওয়ান- ১৯ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ মূর্খের নিরব থাকাটাই সমীচীন। ওরা কথা বললে ওদের বোকামী ধরা পড়ে।

কাহিনী নং- ৫৮৯

শয়তানের বদান্যতা

এক ব্যক্তি একটি পুরানো দেয়ালের পাশে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দেয়ালটি পড়ে যেতে দেখে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ওকে সেখান থেকে উঠিয়ে একদিকে টেনে নিয়ে গেল। এর পর পরই দেয়ালটি পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে বিশ্রামকারী লোকটি বেঁচে গেল। সে তার উপকারকারী লোকটির শুকরিয়া আদায় করলো এবং ওর পরিচয় জানতে চাইলো। সে বললো আমি হলাম শয়তান। লোকটি এ উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করলো- শয়তান হলে এ নেককাজ কেন করলে? শয়তান বললো- ব্যাপার হচ্ছে দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মারা গেলে তুমি শহীদের মর্যাদা পেয়ে যেতে। তাই তুমি শহীদের মর্যাদা না পাবার জন্যই তোমাকে রক্ষা করেছি।(নুজহাতুল মাজালিস ১৬৩ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ বদমযহাবীদের সৎ চরিত্র, বাহ্যিক সৎকর্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদির প্রতি আস্থা রাখা উচিৎ নয়। বদমযহাবীদের মুখ থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনাটাও সমীচীন নয়।

কাহিনী নং- ৫৯০

দুশমনের সৎ পরামর্শ

একবার ফজরের নামাযের সময় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘুম না ভাঙ্গায় কোন এক জন ডাক দিয়ে বললো- জনাব উঠেন, ফজর নামাযের সময় হয়ে গেছে, জামাত শুরু হতে যাচ্ছে; একটু দেরী করলে জামাত হারাবেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া বিচলিত হয়ে উঠে পড়লেন এবং চারি দিকে তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তিনি জোর গলায় বললেন, সে কে, যে আমাকে ঘুম থেকে উঠালো? ঘরের এক কোনা থেকে আওয়াজ আসলো- হুযূর,

আমি শয়তান আপনাকে জাগিয়েছি। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) অবাক হয়ে ভাবলেন, জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য শয়তান কর্তৃক ঘুম থেকে ডেকে দেয়া বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি এ নেককাজ করানোর প্রতি অত উদ্যোগী হলে কেন? এর পিছনে তোমার আসল উদ্দেশ্য কি? আওয়াজ আসলো- জনাব, গত সপ্তাহেও আপনি ফজরের জামাত হারিয়েছিলেন। আপনি এর অনুসোচনায় এত কান্নাকাটি করেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা সেটা কবুল করে আপনাকে সত্তর জামাতের ছওয়াব দান করেছেন, যা আমি রহমতের ফিরিশতাগণের পরস্পর আলোচনায় শুনেছি। আজও আপনাকে শুয়ে থাকতে দেখে আমার ভয় হলো যে আজও যদি জামাত না পান এবং এর জন্য কান্নাকাটি শুরু করেন, তাহলে সত্তর জামাতের ছওয়াব পেয়ে যেতে পারেন। ভয়ে আপনাকে ডেকে দিলাম যেন একটি জামাতের ছওয়াব লাভ করেন। (মছনবী শরীফ)

সবক ঃ বদ মযহাবীদের ওয়াজ নছিহত বাহ্যিক ভাবে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হয়ে থাকলেও ক্ষতিকর। ওদের থেকে দূরে থাকা উচিত। নচেৎ হালুয়ার সাথে বিষ বিশ্রিত করে ঈমান ধ্বংস করবে।

কাহিনী নং- ৫৯১

রাজত্ব ও দুঃস্থ

এক বাদশাহ একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রাম্য এক দুঃস্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে এগিয়ে এসে বললো- জনাব, আপনার বিগত দিনের আনন্দ আহলাদ আর আমার দুঃখ দুর্দশা এ মুহূর্তে ফিরায়ে আনতে পারবো না। তাই এ ক্ষেত্রে আপনি ও আমি বরাবর। আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন এবং আমিও এক দিন মরে যাব। তাই এ বিষয়েও আমরা বরাবর। আপনার থেকে রাজত্বের হিসেব নেয়া হবে এবং আমার থেকে অভাব অনটনের হিসেব নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার হিসেব দিতে বড় কষ্ট হবে। এ কথা শুনে বাদশাহ কেঁদে দিলেন এবং বললেন, যদি আল্লাহ করুনাময় না হতেন এবং প্রদত্ত দান ফিরায়ে নিতেন, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম যেন আমার থেকে রাজত্ব ফিরিয়ে নেন। (নজহাতুল মাজালিস ৪৩১ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ মৃত্যুর পর রাজা ফকীর সব বরাবর হয়ে যাবে। তবে গরীবের তুলনায় রাজা বাদশাদের অনেক হিসেব দিতে হবে।

কাহিনী নং- ৫৯২

বদান্যতার প্রতিফল

একবার হযরত ওয়াকেদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি এক উদার ব্যবসায়ীর কাছে কর্জ চাইলেন। ব্যবসায়ী বারশ টাকার একটি থলি হযরত ওয়াকেদীর সামনে রেখে বললেন- এ গুলো ছাড়া আমার কাছে আর কোন টাকা নেই। হযরত ওয়াকেদী সে থলি নিয়ে ঘরে আসতে, না আসতে, এক হাশেমী তাঁর কাছে কর্জ চাইতে এলেন এবং স্বীয় প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। হযরত ওয়াকেদী তাঁর ঋনের টাকা থেকে কিছু ওনাকে দিতে এবং কিছু নিজের জন্য রাখতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ওয়াকেদীর স্ত্রী সাহেবা বললেন- আপনি বাজারের একজন ব্যবসায়ীর কাছে কর্জ চাইলেন। সে আপনাকে ওর সমস্ত পূঁজি দিয়ে দিলেন। আর এ হলেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আসাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চাচার বংশধর। একে সামান্য দেয়াটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। হযরত ওয়াকেদী এ কথা শুনে থলিসহ সব টাকা ওনাকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহর কি রহস্য, হাশেমী লোকটি টাকার থলি নিয়ে যে মাত্র ঘরে পৌঁছলেন, সেই ব্যবসায়ী, যিনি হযরত ওয়াকে'কে টাকা ধার দিয়েছিলেন, ওনার কাছে আসলেন এবং ওনার থেকে কর্জ চাইলেন। হাশেমী লোকটি সেই টাকার থলিটি ওকে দিয়ে দিলেন। ব্যবসায়ী টাকার থলিটা দেখে অবাক হলেন যে এটা তাঁরই থলি ঘুরে ফিরে পুনরায় তাঁর হাতে এসেছে। হযরত ওয়াকেদী হযরত ইয়াহিয়া বরমকীর কাছে সেই থলির ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত ইয়াহিয়া বরমকী এ সব বৃত্তান্ত শুনে দশ হাজার টাকার একটি থলি বের ওনার হাতে দিয়ে বললেন- এখান থেকে দু'হাজার তোমার, দু'হাজার হাশেমী, দু'হাজার ব্যবসায়ী এবং চার হাজার তোমার স্ত্রীকে দিবে। (নুজহাতুল মাজালিস ৩৯০ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আগের যুগের মুসলমানেরা একে অপরকে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশীর প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উর্ধে স্থান দিতেন। এ বদান্যতার প্রতিফল অনেকটা এ দুনিয়াতেও লাভ করতেন। কিন্তু আজ সে ধরনের মুসলমানও নেই, সেই মানসিকতাও নেই।

কাহিনী নং ৫৯৩

বুজুর্গানে কিরামের দান

হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হাদীছ শাস্ত্রে খুবই উচ্চস্তরের ইমাম ছিলেন। তার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁর পিতার ঘরে যে শিশু জন্ম হতো, মারা যেত। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন হযরত শেখ সনাকরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন- হুযূর, আমার ঘরে যে শিশু জন্ম হয়, সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। আমি খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। হযরত শেখ বললেন, যাও, তোমার এমন এক সন্তান হবে, যিনি জ্ঞান গরিমায় সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হবে। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জন্ম গ্রহণ করেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন- ১১৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের পবিত্র মুখ থেকে যা বের হয়, তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা ওনাদের দুআ কখনো বিফল করেন না।

কাহিনী নং- ৫৯৪

ইমাম বোখারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর চক্ষুরোগ

ইমাম বোখারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর শৈশব কালে এমন চক্ষুরোগ হয়েছিল যে ওনার দৃষ্টি শক্তি প্রায় চলে গিয়েছিল। এতে ওনার আম্মাজান একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং মনে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। একরাত্রে তিনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি (আঃ) বললেন, যাও, তোমার প্রার্থনা কবুল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমার সন্তানের চক্ষু সুস্থ করে দিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে হযরত ইমাম বোখারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর চক্ষুদ্বয় একেবারে সুস্থ। (মুকাদ্দমা ফতহুল বারী ৫৬৩ পৃঃ)

সবক ঃ নবীগণের বেসালের পরও ফয়েজ জারি থাকে। তাঁরা (আঃ) মসিবত গ্রস্থদের নানাভাবে সাহায্য করেন।

কাহিনী নং- ৫৯৫

ওলীর মাযারে ফরিয়াদ

একবার হযরত আবু আলী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হন এবং এ চিন্তায় দিন রাত খুবই পেরেশানী অবস্থায় অতিবাহিত করছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেখা পেলেন। হুযূর (আলাইহিস সালাম) ফরমালেন- হে আবু আলী, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়ার মাযারে গিয়ে দুআ প্রার্থনা কর এবং তোমার সমস্যার কথা বল। এতে তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে হযরত আবু আলী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ইরশাদ মোতাবেক হযরত ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মাযারে গিয়ে দুআ প্রার্থনা করে স্বীয় হাজত পেশ করেন। এতে তাঁর হাজত পূর্ণ হয়ে যায় এবং যাবতীয় চিন্তা পেরেশানী দূরীভূত হয়ে যায়। (তাহজীবুত্তাহজীর ২৯৯ পৃঃ ১১ জিঃ)

সবক ঃ স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিপদগ্রস্থ এক ওলীকে মাযারে গিয়ে হাজত পেশ করার জন্য বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে মাযারে যাওয়া ও ওখানে গিয়ে হাজত পেশ করা নিষেধ নয়। যারা ওলীর মাযারে যাওয়া থেকে বাধা দেয়, তারা নবীর দুশমন।

কাহিনী নং- ৫৯৬

উহুদের নালা

উহুদ পাহাড়ের গোঁড়া ঘেঁষে একটি নালা প্রবাহমান ছিল। বনু উমাইয়ার যুগে একবার অতিবৃষ্টির কারণে সেই নালায় খুব জোরে পানি প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে উহুদ যুদ্ধের এক শহীদের লাশ মোবারক বের হয়ে এসেছিল, যেটা থেকে তখনও টাটকা রক্ত বের হচ্ছিল। (তফসীরে হক্কানী- ১৫১ পৃঃ ৩ জিঃ)

সবক ঃ কয়েকশ বছর পরও এক শহীদ সাহাবীর লাশ মুবারক অবিকল রয়ে গেল। যার বদৌলতে শহীদগণ এ মর্তবা লাভ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে যারা বলে যে তিনি মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন, তারা কত বড় মূর্খ ও গুমরাহ।

কাহিনী নং- ৫৯৭

কাফনে আহাদনামা লিখার ফজীলত

এক বুজুর্গ বসরা শহরে এমন এক মৈইয়্যাতকে দেখলেন, যার সাথে লাশ বহনকারী চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি আশ্চর্য হলেন যে এত বড় শহরে এ গরীব লোকের জানাযার সাথে একটি লোকও নেই। এর রহস্য জানার জন্য তিনিও জানাযার সাথে গেলেন। কবরস্থানে পৌছে যথারীতি জানাযার নামাযের পর দাফন করা হলো। দাফনের পর তিনি লাশ বহনকারী লোকদের কাছে জানতে চাইলেন- ব্যাপার কি? এ জানাযার সাথে কেউ আসলো না কেন? ওরা একটু দূরে দাঁড়ানো এক বয়স্কা মহিলার দিকে ইশারা করে বললো- ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। এ ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। বুজুর্গ লোকটি সেই মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন, ওনি হাত উঠিয়ে ভারক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন এবং একটু পরে হেসে দিলেন। বুজুর্গ লোকটি এর রহস্য জানতে চাইলে ভদ্র মহিলা বলেন, এ লাশটা আমার ছেলের। সে ছিল বড় বদকার। এমন কোন কুকাজ নেই যে সে করেনি। তিন দিন অসুস্থ থাকার পর গত রাত্রে সে আমাকে বলে যে- মা, আমার শরীর খুবই খারাপ, মনে হয় বাঁচবো না। আমি মারা গেলে কাউকে খবর দিও না। কারণ আমার মৃত্যুর খবর শুনলে সবাই খুশী হবে। জানাযার জন্য কেউ আসবে না। তবে আপনি একটি কাজ করবেন- আমার আংটির উপর কলেমা শরীফ খুঁদায়ে আমার হাতে পরিয়ে দিবেন এবং আমার গালে আপনার পা রেখে বলবেন- এটা আল্লাহর অপরাধীর শাস্তি। আমার দাফনের পর দুআ করবেন এবং বলবেন- হে আল্লাহ, আমি ওর প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও। এ সব কথা বলার পর সে মারা যায় এবং তার অছিয়ত মত সব কিছু করা হয়। এ মাত্র যখন আমি দুআ করছিলাম, তখন আমি আমার ছেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে বললো- মা, আমি অসীম মেহেরবান আল্লাহর কাছে পৌছে গেছি। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা শুনে আমি হেসে দিয়েছি। (রুহুল বয়ান- ৬০০ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ মৈইয়্যাতের কাফনের উপর কলেমা শরীফ লিখা এবং মৈইয়্যাতের জন্য দুআ করা খুবই উপকারী। যারা এর বিরোধীতা করে, তারা মৈইয়্যাতের দুশমন।

কাহিনী নং- ৫৯৮

শ্রদ্ধা ও সম্মান

কাজী ইসমাইল বিন ইসহাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত ইমাম ইব্রাহীম খরলী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাক্ষাত লাভের খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হযরত ইমাম ইব্রাহীম সব সময় এ বলে পরিহার করতেন যে তিনি হলেন দেশের কাজী, তাঁর পাহারায় রয়েছে দারোয়ান ও নিরাপত্তা রক্ষী। তাই এ সব অতিক্রম করে তাঁর দরবারে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজী সাহেব এ আপত্তির কথা জানতে পেরে সমস্ত দারোয়ান ও নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে সরিয়ে দিলেন এবং একান্ত আগ্রহ সহকারে ইমাম ইব্রাহীমকে আমন্ত্রন জানালেন। অতঃপর ইমাম ইব্রাহীম তশরীফ আনলেন এবং যখন জুতা খুলে রেখে কার্পেটের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কাজী সাহেব এগিয়ে এসে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জুতাদ্বয় উঠিয়ে একটি রেশমী কাপড়ে মুড়িয়ে এক কিনারে রেখে দিলেন। বিদায়ের সময় কাজী সাহেব নিজেই রেশমী কাপড় থেকে জুতাদ্বয় বের করে দিলেন। ইমাম সাহেব তাঁর প্রতি কাজী সাহেবের এ সম্মানবোধ দেখে বললেন- غـفـر الله لَكَ كَمَا اَكـرمـت العلم ইলমের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

কাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর কোন একজন তাঁকে স্বপ্ন দেখলেন এবং তার কি অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন- ইমাম ইব্রাহীমের দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আহলে হাদীছের সাপ্তাহিক পত্রিকা আল-এতেসাম, ১৫ই জানুয়ারী সংখ্যা - ১৯৬০ সাল)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের তাজীম এবং তাঁদের ব্যবহৃত আসবাব পত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের দ্বারা আল্লাহর করুনা ও মাগফেরাত লাভ করা যায়। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে আগের যুগের লোকেরা আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের প্রতি উচ্চ ধারনা পোষন করতেন। এমন কি তাঁদের জুতার প্রতিও খুবই সম্মান দেখাতেন। অথচ এ কাজ কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং কোন সাহাবীর এ রকম আমলের নজির নেই। কিন্তু এরপরও আহলে হাদীছ তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছে যে কাজী সাহেব এ ধরনের কাজের দ্বারা নাজাত পেয়েছে। তাহলে যারা স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর

সাথে সম্পর্কিত জিনিসের প্রতি সম্মান বোধ করে, মিলাদ মাহফিলকে রং বেরং এর রেসমী কাপড়ের পতাকা দ্বারা সজ্জিত করে, বারই রবিউল আউয়াল জুলুস বের করে আনন্দ প্রকাশ করে, হুযূরের নাম মুবারক শুনে আঙুল চুমু দিয়ে চোখে লাগায়, তাদের জন্য এ গুলো কেন নাজাতের উসীলা হবে না? আর এ সব কাজের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কুরআন হাদীছের দলিল চাওয়াটা কি শোভা পায়?

কাহিনী নং- ৫৯৯

আঙুর হাদিয়া

হযরত মির্জা মুজাহের জানজানা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে এক ব্যক্তি আঙুর হাদিয়া পাঠিয়েছিল। হযরত একটি আঙুর মুখে নিয়ে ফেলে দিলেন। দু'এক দিন পর সেই আঙুর প্রেরণকারী হযরতের দরবারে আসলো এবং আরয করলো- হুযূর, আমি আঙুর পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন কি? হযরত বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। সে পুনরায় আরয করলো, হুযূর আপনি খেয়েছিলেন? ফরমালেন, মিয়া কি বলবো, সেই আঙুর গুলো থেকে মুর্দারের গন্ধ বের হচ্ছিল। লোকটি এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল- আঙুরের সাথে মুর্দারের কি সম্পর্ক, কিছুই বুঝতে পারলো না। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে আঙুরগুলো ছিল শ্মশানে রোপিত আঙুর গাছের। (থানবী সাহেবের আশরাফুল মওয়ায়েজ-১০২ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ হুযূরের একজন নগন্য গোলামের যেখানে একটুকু আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে, সেখানে হুযূরের অসীম জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তারা কত বড় জাহিল, যারা হুযূরের জ্ঞান সম্পর্কে কটুক্তি করে?

কাহিনী নং- ৬০০

হযরত খিজির আলাইহিস সালাম

হযরত খিজির আলাইহিস সালাম এমন এক সমাবেশে পৌঁছলেন যেখানে হাদীছের আলোচনা হচ্ছিল। ওখানে এক ব্যক্তি একটু দূরে আলাদা হয়ে নামায পড়ছিল। হযরত খিজির ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাদীছের আলোচনায় কেন অংশ গ্রহণ করছ না? লোকটি বললো- আপনি আমাকে বলুন, এ লোক কার থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেছে? হযরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, সুফিয়ান আওয়ারী প্রমূখ থেকে। লোকটি বললো- যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা থেকে হাদীছ বর্ণনা করে, ওর কি প্রয়োজন সুফিয়ান আওয়ারীর রেওয়ায়েত

শুনার? হযরত খিজির বললেন- এর প্রমাণ কি? তুমি কি সে রকম ব্যক্তি? লোকটি বললো- আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনেন না। আপনি খিজির। আপনি বলুন- আমি কে? (থানবী সাহেবের আত-তাজকিরা- ৯৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নিকটতর বান্দাগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান খুবই ব্যাপক হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞানকে (মা যাল্লা) গরু-গাধার জ্ঞানের সাথে তুলনা দেয়, সে কত বড় গুশতাখে রসূল।

কাহিনী নং- ৬০১

জ্বীন হত্যা

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় এক জ্বীন সাপের আকৃতি ধারন করে তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সাপ মনে করে মেরে ফেললেন। একটু পরে দু'ব্যক্তি এসে তাঁকে মসজিদ থেকে জ্বীনদের বাদশাহের কাছে নিয়ে গেল। এক জ্বীন বাদী হয়ে বাদশাহের কাছে আরয করলো- হুযূর, শাহ সাহেব আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। অতএব শরীয়ত মুতাবিক ওনার মৃত্যুদন্ড হওয়া চায়। বাদশাহও মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য মনস্থ করলো। কিন্তু এক বৃদ্ধজ্বীন প্রতিবাদ করে বললো- শরীয়ত মতে শাহ সাহেবের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। কেননা আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি- من قتل في غير زيه فدمه مدر অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যাকে হত্যা করা জায়েয নয়, সে যদি এমন জাতির বেশভুষায় থাকে, যাকে হত্যা করা জায়েয, তাহলে ওকে কেউ হত্যা করলে, সেটা মাফ।

অতএব, যেহেতু এ জ্বীন সাপের আকৃতিতে ছিল, যাকে হত্যা করা জায়েয, সেহেতু সাপ মনে করে এ হত্যার জন্য উপরোক্ত হাদীছ মতে শাহ সাহেবের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। বাদশাহ এ হাদীছ শুনে শাহ সাহেবকে রেহাই দিল এবং দু'জ্বীন তাঁকে যথাস্থানে পৌছিয়ে দিল। (আত-তাহরীরুল আফহাম- ৫৪ পৃঃ)

সবক ঃ জ্বীনেরাও কুরআন সুন্নাহের কদর করে থাকে। তাদের মধ্যে এখনও সাহাবী জ্বীন জীবিত আছে।

কাহিনী নং- ৬০২

রাজত্বের মূল্য

খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে অনেক ওলামায়ে কিরাম আনাগোনা করতেন। তাঁদের সাথে খলিফা হারুনুর রশীদের সুসম্পর্ক ছিল। দরবারে সব সময় ওলামায়ে কিরামের সমাগম থাকতো। একবার তিনি ভীষন তৃষ্ণা বোধ করায় পানি আনালেন এবং পান করতে মুখের কাছে নিলেন। এমন সময় এক মওলানা সাহেব আওয়াজ দিলেন- আমীরুল মুমেনীন! একটু অপেক্ষা করুন। আমি একটি কথা জিজ্ঞেসা করতে চাচ্ছি। খলীফা সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছ থেকে পানির পাত্র সরিয়ে নিলেন এবং কি বলতে চায়, জানতে চাইলেন। মাওলানা সাহেব বললেন- আচ্ছা, আপনি যদি কোন সময় এমন অবস্থায় পতিত হন, যেমন আপনি এমন কোন জঙলে গেলেন, যেখানে পানি পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনি খুবই তৃষ্ণাবোধ করলেন, তখন আপনি এতটুকু পানি কত মূল্য দিয়ে ক্রয় করবেন? খলীফা বললেন, খোদার কসম, অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে হলেও পান করবো। মাওলানা সাহেব বললেন, ঠিক আছে, এবার পান করুন। খলীফা যখন পানি পান করে নিলেন, মাওলনা সাহেব পুনরায় বললেন, আচ্ছা, এ পানি যদি বের না হয় অর্থাৎ প্রশ্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি কত মূল্য দিয়ে এ পানি বের করাবেন? খলীফা বললেন, খোদার কসম, প্রয়োজনে সম্পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে দিব। এবার মাওলানা সাহেব বললেন, এটাই আপনার রাজত্বের বাস্তবতা, এটা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। (মলফুজাতে আলা হযরত ৩৬ পৃঃ ৩ জিঃ)

সবক ঃ দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা নিয়ে কোন সময় গর্ব করতে নেই।

কাহিনী নং- ৬০৩

মদখোরের পরিনতি

এক তাবেয়ী কোন এক গোত্রের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওখানে এক কবরস্থানে দেখলেন যে, আসরের সময় একটি কবর ফেটে গেল এবং সেখান থেকে এমন এক লোক বের হয়ে আসলো, যার মাথা গাধার মাথার মত ছিল এবং

শরীর ছিল মানুষের মত। সে কবর থেকে বের হয়ে তিনবার গাধার আওয়াজের মত বিশ্রী আওয়াজ করে পুনরায় করবে ঢুকে গেল এবং কবরের ফাটাটা মিলে গেল। লোকটির স্ত্রীর কাছ থেকে জানা গেল যে সে বেশী মদপান করতো। ওর মা ওকে মদপানে বারবার বারন করলে সে বলতো-" গাধার মত ঘ্যানঘ্যান করছ কেন?" একদিন আসরের সময় সে মারা যায়। এর পর থেকে প্রতি দিন আসরের সময় ওর কবর ফেটে যায় এবং ওর কবর থেকে গাধার আওয়াজ শুনা যায়। (নুজহাতুল মাজালিস ৩৬৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ মদপান মারাত্মক গুনাহ। এর পরিনতি খুবই ভয়াবহ। মায়ের সাথে বেআদবীর পরিনাম ফল আরও মারাত্মক।

কাহিনী নং- ৬০৪

পাথর ও ফুল

এক দিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এক ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইহুদী লোকটি তাঁর শানে বেআদবী করলো এবং যা তা বললো। তিনি (আলাইহিস সালাম) খুবই নম্র ও ভদ্রভাবে ওর কথার উত্তর দিলেন। তাঁর সহচররা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন- كل احد ينفق مما عنده অর্থাৎ যার কাছে যেটা থাকে, সেটা খরচ করে। (নুজহাতুল মাজালিস- ৩৮৩ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তির আসল রূপ ফুটে উঠে। ভদ্রলোকের মুখে কোন সময় বিশ্রী কথা বের হয় না।

কাহিনী নং- ৬০৫

শ্রম ও মুজুরী

এক ব্যক্তি বিনা পানাহারে কোন এক পাহাড়ের গুহায় বসে ইবাদত করছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর কাছে ওহী পাঠালেন- ওকে বলুন- তুমি কি এ ধরনের বন্দেগী দ্বারা আমার হেকমতের কারখানা ধ্বংস করতে চাও? যাও, কোন জায়গায় গিয়ে কাজকর্ম করে দু'চার টাকা উপার্জন করার চেষ্টা কর। আমি বান্দাদেরকে বান্দাদের মাধ্যমেই দিতে পছন্দ করি। (নুজহাতুল মাজালিস ৪৪৪ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই রিযিক দাতা। কিন্তু মানুষের মেহনত ও চেষ্টা করাও প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা কোন ওসীলায় স্বীয় বখশীশ ও ইহ্সান দান করেন।

কাহিনী নং- ৬০৬

খেজুর গাছ

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দাজানা (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রতিদিন ফজরের নামায পড়ে তাড়াহুড়া করে মসজিদ থেকে ঘরে চলে যেতেন। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ থেকে রাত্রে খেজুর ঝড়ে আমার উঠানে পড়ে। তাই আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওগুলো কুড়িয়ে প্রতিবেশীর উঠানে নিক্ষেপ করি, যাতে আমার ছেলে মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে ওগুলো কুড়াবার সুযোগ না পায়। এ কথা শুনে দয়াল নবীর মন কেঁদে উঠলো। তিনি ওনার প্রতিবেশীকে ডেকে এনে বললেন- তোমার খেজুর গাছটা জান্নাতের দশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। এ কথা শুনে হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! অমুক জায়গায় আমার দশটি খেজুর গাছ আছে, আমি সে দশটি গাছ একে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি জান্নাতের গাছ গুলো আমাকে দিয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত সেটাই সিদ্ধান্ত হলো এবং আবু দাজানার প্রতিবেশীও এতে রাজি হলো। পর দিন সকালে দেখা গেল যে সেই খেজুর গাছটি আবু দাজানার উঠানে শোভা পাচ্ছে। (নুজহাতুন মাজালিস ৩৮৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) সীমাহীন তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন, পরের হককে খুবই ভয় করতেন। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জান্নাত ও জান্নাতের প্রতিটি জিনিসের মালিক ও মুখতাব।

কাহিনী নং ৬০৭

আবদুল করীম

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য ডেকে আনলো। লোকটি বিনীতভাবে বললো- জনাব, আমার কাছে অনেক লোকের আমানত রয়েছে, আপনি মেহেরবানী করে আমাকে এতটুকু সময় দিন, যেন আমি গিয়ে ওদের আমানত সমূহ ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। হাজ্জাজ বললো, তোমার পক্ষে কাউকে জিম্মদার করতে পারলে, যেতে পার। লোকটি আশে পাশে জিম্মদার খুজতে লাগলো। এক ভদ্রলোককে দেখে সে ওর নাম জিজ্ঞেস করলো। লোকটি বললো আমার নাম আবদুল করীম (দয়ালু আল্লার বান্দা)। দয়ালু আল্লাহর বান্দার অন্তরে নিশ্চয় দয়া থাকবে'- এ বলে সে ওনাকে হাজ্জাজের সমস্ত ঘটনা শুনালো। সব কথা শুনে ভদ্র লোকটি বললো ঠিক আছে আমি তোমার জিম্মাদার হতে রাজি আছি। আমি আমার নামের অর্থ বৃথা প্রমাণিত করবো না। অতঃপর ভদ্রলোকটি ওর জিম্মাদার হলো এবং সে জামানত ফেরত দেয়ার জন্য চলে গেল। জামানত ফেরত দিয়ে ফিরে আসতে একটু দেরী হাওয়ায়, হাজ্জাজ সেই জিম্মাদারকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। জল্লাদ ওকে হত্যা করার জন্য জাল্লাদ খানায় নিয়ে গেল। সে সময় লোকটি দু'রাকাত নফল নামায পড়ার সময় চাইলে হাজ্জাজ তা মনজুর করে। লোকটি দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে বললো- হে আল্লাহ! আমি আবদুল করীম (দয়ালু আল্লার বান্দা) বলে লোকটি আমার সহযোগিতা চেয়েছে। তাই আমি ওর জিম্মাদার হয়েছি। এখন আপনি করীম হিসেবে আমার প্রতি দয়া করুন। ইতোমধ্যে জাল্লাদ ওর ছিরচ্ছেদ করার জন্য তৈরী হয়ে গেল। এমন সময় সেই লোকটি এসে গেল। জাল্লাদ ওকে দেখে বললো- জান দিতে কেন এসে গেলে? তোমার জিম্মাদারকেতো হত্যা করতে যাচ্ছিলাম। লোকটি বললো- আমাকে আল্লাহ তাআলার সেই বাণী। اوفــــو بعـهـدى اوف بعـهـدكم (তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ কর, আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করবো) আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া ওয়াদা

রক্ষা ঈমানের একটি বড় শাখা। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার খাতিরে ঈমানের ক্ষতি করতে পারি না। হাজ্জাজ ওর এ বক্তব্য শুনে উভয়কে ছেড়ে দিল এবং উভয়ের অটল মনোভাবের প্রশংসা করলো। (নুজহাতুল মাজালিস- ৪ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ সত্যিকার মুসলমান বিপদের সময় স্বীয় ভাই এর কাজে আসে এবং সত্যিকার মুসলমান ওয়াদা রক্ষার্থে স্বীয় জানের পরওয়া করে না।

কাহিনী নং- ৬০৮

হেকমত

মসরুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি জংগলে বাস করতো এবং ওর সাথে একটি কুকুর, একটি গাধা ও একটি মোরগ ছিল। গাধা প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র আনা নেয়া করতো, কুকুর পাহারাদারের কাজ করতো এবং মোরগের কাজ ছিল সময় বাতলানো অর্থাৎ নামাযের জন্য ওকে জাগিয়ে দিত। এক দিন শিয়াল এসে মোরগটা ধরে নিয়ে গেল। এতে লোকটি বললো- আলহামদু লিল্লাহ, এতে, নিশ্চয়ই কোন কল্যান নিহিত আছে। কয়েকদিন পর কুকুরটি মারা গেল। এতেও সে বললো- আলহামদু লিল্লাহ, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য থাকবে। কয়েক দিন পর ওর প্রতিবেশীদের ঘরে ডাকাত আসলো এবং ওদের সমস্ত মাল পত্র লুঠ করে নিয়ে গেল। ওদের ঘরে আওয়াজ দানকারী পশু থাকায় ডাকাতেরা ওদের ঘরের হদিস পেয়ে যায় এবং এসে সব কিছু লুঠ করে নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ঘরে এ রকম আওয়াজ দান কারী পশু না থাকায় ডাকাতদল সে দিকে যায়নি। ফলে ডাকাতি থেকে রক্ষা পেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন প্রতিবেশীদের ক্ষয়ক্ষতি দেখলো, তখন লোকটি বললো, আমার ওসব প্রাণী মরে যাওয়ায় আমার জন্য ভালই হলো। অন্যথায় আজ আমার ঘরও লুণ্ঠিত হতো। (নুজহাতুল মাজালিস- ১৫০ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহু তাআলা যা করেন, তা ভালই করেন। তাঁর প্রতিটি কাজে নিশ্চয় কোন না কোন হেকমত নিহিত থাকে।

কাহিনী নং- ৬০৯

পায়খানার পোকা

এক ব্যক্তি পায়খানার পোকা দেখে মনে মনে বললো, এ ধরনের নিকৃষ্ট প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কী রহস্য থাকতে পারে? এটা এমন প্রাণী, যেটা দেখলে মানুষ ঘৃনা ভরে থু থু ফেলে এবং যার কোন সুরত নেই, নেই কোন প্রয়োজনীয়তা। কিছু দিন পর লোকটি এমন এক মারাত্মক ফোড়ায় আক্রান্ত হলো, যেটা কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছিল না। একদিন এক ডাক্তার এসে ফোঁড়াটি দেখে বললো- এর একটি মাত্র চিকিৎসা আছে। সেটা হলো পায়খানার পোকা আগুনে পুড়ে ছাই করে লাগালে ভাল হয়ে যাবে। সে মতে চিকিৎসা করার পর লোকটি আরোগ্য লাভ করে। এ বার লোকটি বুঝতে পারলো, আল্লাহ তাআলা কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি করেন নি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে হেকমত নিহিত রয়েছে। (নুজহাতুল মাজালিস- ১৫৫ পৃঃ ১জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে মানব কল্যান নিহিত রয়েছে।

কাহিনী নং- ৬১০

অন্ধ পাখী

হযরত আনস (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাথে জংগলে গিয়েছিলাম। সেখানে এক অন্ধ পাখীকে এক বৃক্ষে ঠোকর মারতে দেখে হুযূর আমাকে বললেন, হে আনস, জান, এ পাখীটি কি বলছে? আমি বললাম, জানি না। হুযূর ফরমালেন- এ পাখীটি বলছে- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অন্ধ করেছ, আবার ক্ষুধার্তও। একটু পরে একটি ফড়িং উড়ে এসে পাখীটির মুখে পড়লো এবং পাখীটি সেটা খেয়ে নিল। এরপর পাখীটি পুনরায় বৃক্ষে ঠোকর মারতে লাগলো। হুযূর ফরমালেন, হে আনস, জান, পাখীটি এখন কি বলছে? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলে হুযূর বলেন- এখন পাখীটি বলছে- من توكل على الله كفاه অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ ওর ইচ্ছা পূর্ণ করে দেয়। (নুজহাতুল মাজালিস- ৪৪২ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে, সব কাজ পূর্ণ হয়।

কাহিনী নং- ৬১১
চোর ধরা পড়েছে

এক বাদশাহ তাঁর এক গোলামকে খুবই ভালবাসতেন। এর জন্য অন্যান্য গোলামরা সেই গোলামের প্রতি খুবই ক্ষ্যাপা ছিল। একবার বাদশাহ সব গোলামদেরকে শাহী বাগান থেকে ফল আনতে পাঠালেন। বাদশাহের প্রিয় গোলামটি ব্যতীত অন্যারা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে সমস্ত ফল নিজেরা খেয়ে ফেললো এবং বাদশাহের কাছে এসে অভিযোগ করলো যে তাঁর প্রিয় গোলামটি সব ফল খেয়ে ফেলেছে। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে এক ডেকসি পানি আনিয়ে ওখানে সামান্য রসূন মিশিয়ে আগুনে গরম করালেন। অতঃপর ঐ পানি সব গোলামদেরকে পান করিয়ে দৌড়তে নির্দেশ দিলেন। একটু দৌড়ানোর পর সবাই বমি করে দিল এবং বাদশাহের সেই প্রিয় গোলাম ব্যতীত অন্য সবার বমিতে টাটকা ফলের নিদর্শন পাওয়া গেল। (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ জ্ঞানী রাজা বাদশাহরা কান কথায় পাত্তা দিতেন না। তাঁরা যে কোন বিষয়ে চুড়ান্ত ভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্তে উপনিত হতেন।

কাহিনী নং- ৬১২
শাওয়ানা

বসরা শহরে শাওয়ানা নামে এক নামকরা সুন্দরী গায়িকা ছিল। সারা শহরে সে এক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আমীর ওমরাদের প্রতিটি গানের মাহফিলে সে ছিল প্রধান আকর্ষন। একদিন সে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কোন এক জায়গায় যাবার সময় পথের ধারে একটি সমাবেশে অনেক লোককে কান্নাকাটি করতে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো এবং মনে করলো যে হয়তো নামকরা কেউ মারা গেছে। সে কৌতুহল নিবারনের জন্য সমাবেশের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে এক ধর্মীয় বক্তা জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তি এবং আল্লাহর ভয়াল আজাবের কথা বর্ণনা করছেন এবং সমবেত লোকেরা আল্লাহর ভয়ে কাঁদছে। শাওয়ানার উপরও সেই ওয়াজ প্রভাব বিস্তার করলো। সেও আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ওয়াজ শেষে সে সেই ধর্মীয় বক্তার কাছে গিয়ে বললো, হুযূর, আমি যদি তওবা করি, আল্লাহ কি

আমার তওবা কবুল করবেন? এবং আমার গুনাহ কি মাফ করে দিবেন? মাওলানা সাহেব বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ নিশ্চয় মাফ করবেন। সে পুনরায় বললো, আমি যদি অগনিত গুনাহ করে থাকি এবং আমি যদি বড় বদকার হয়ে থাকি? মাওলানা সাহেব বললেন, তুমি কেন, তোমার থেকে বড় বদকার হলেও মাফ করে দিবেন। এমনকি সেই কুখ্যাত গায়িকা শাওয়ানাও যদি মনে প্রাণে তওবা করে, আল্লাহ ওকেও মাফ করে দিবেন। শাওয়ানা কেঁদে দিয়ে বললো, হুযূর, আমিই সেই শাওয়ানা। আজ আমি মনে প্রাণে তওবা করছি। আগামীতে আর কোন গুনাহ করবো না।

এরপর সে ঘরে ফিরে গিয়ে তার সব বাঁদীদেরকে মুক্ত করে দিল এবং সমস্ত ধন সম্পদ গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিল এবং একাগ্র চিত্তে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে গেল। এ ভাবে সে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করে এবং সমগ্র বসরায় বড় নেককার মহিলা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। (রাউনাকুল মাজালিস- ২৪ পৃঃ)

সবক ঃ আন্তরিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেন।

কাহিনী নং- ৬১৩
একটি ইটের আত্মকাহিনী

বণী ইসরাইলের এক লোক মারা যাবার সময় একটি ঘর ও দুইটি ছেলে রেখে যায়। ছেলেদ্বয় ঘরটি ভাগাভাগি করে নেয়ার সময় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং একে অপরকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়। এমন সময় ঘরের একটি ইট থেকে উভয়ে এ আওয়াজটি শুনলো- হে ছেলেরা, আমার খাতিরে ঝগড়া বন্ধ কর। আমার দিকে দেখ, আমি কোন এক সময় অনেক বড় বাদশাহ ছিলাম। ৩৭০ বছর হায়াত পেয়েছিলাম। মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত কবরে ছিলাম। অতঃপর কবরস্থানটি বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে যায়। এক দিন সেখান থেকে মাটি খনন করে ইটের ভাটায় নিয়ে গিয়ে ইট তৈরী করা হয়। এ ইটের মধ্যে আমার ধ্বংসাবশেষ থেকেও একটি ইট তৈরী হয় এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইটের আকৃতিতে ছিলাম। পরে আমাকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে রাস্তায় ব্যবহার করা

হয়েছিল। এ অবস্থায় একশ ত্রিশ বছর পর্যন্ত রাস্তায় পড়ে ছিলাম। অতঃপর পুনরায় মাটি হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় বার আবার আমাকে ইট বানানো হয় এবং এ ঘরে লাগানো হয়। তিনশ বছর পর্যন্ত এ ঘরে আছি। ছেলেরা, কেন ঝগড়া করতেছ? তোমাদেরও এ অবস্থা হবে। (রাউনাকুল মাজালিস- ৩০ পৃঃ)

সবক ঃ দুনিয়াবী অবস্থানটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর জন্য ঝগড়া বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কাহিনী নং- ৬১৪

অস্থায়ী দুনিয়া

বনী ইসরাইলের এক ধর্মপরায়ন নওজোয়ানের কাছে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। এ খবর তৎকালীন বাদশাহের কানে পৌছলে, তিনি সেই নওজোয়ানকে তলব করেন এবং জিজ্ঞেস করেন তোমার কাছে নাকি খিজির আলাইহিস সালাম আনাগোনা করেন? সে বললো- হ্যাঁ। এ উত্তর শুনে বাদশাহ বললেন- এবার যখন তিনি আসবেন, তুমি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অন্যথায় তোমাকে কতল করে ফেলবো। দু' এক দিন পর যখন খিজির আলাইহিস সালাম তশরীফ আনলেন, তখন সেই নওজোয়ান ওনার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। সমস্ত কথা শুনার পর হযরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, চলো, বাদশাহের কাছে যাই। অতপর উভয়ে বাদশাহের কাছে গেলেন। বাদশাহ সেই যুবকের সাথে আগুন্তুককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি খিজির? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি খিজির। বাদশাহ বললেন, আপনার জীবনেতো অনেক কিছু দেখেছেন, আমাকে বড় আশ্চর্যজনক কোন কিছু শুনান। হযরত খিজির বললেন, হ্যাঁ, আমি দুনিয়ায় অনেক বড় বড় আশ্চর্যকর ঘটনাবলী অবলোকন করেছি। ওখান থেকে একটি বলছি, শুনুন ঃ

আমি একবার এক ঘন জনবসতি পূর্ণ অতি সুন্দর শহর অতিক্রম কালে শহরের এক বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ শহরের গোড়া পত্তন কখন হয়েছিল? লোকটি বলেছিল, এটা অনেক পুরোনো শহর। এর সূচনা আমার জানা নেই। এমন কি আমার বাপ দাদারাও জানে না। আল্লাহই জানেন, কখন থেকে এ

শহর এ ভাবে চলে আসতেছে। পাঁচশ বছর পর আমি পুনরায় সে শহরটি অতিক্রম করলাম। তখন সেখানে শহরের কোন নাম গন্ধ পেলাম না। সেটা এক বিরাট বনভূমিতে পরিনত হয়ে গিয়েছিল। বনে এক ব্যক্তিকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম- কখন থেকে এ শহরটি এ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল? লোকটি আমার কথা শুনে হেসে দিল এবং বললো, এখানে শহর ছিল কখন। এ জায়গাতো অনেক দিন থেকে জংগলই আছে। আমার বাপদাদারাও এখানে জংগল দেখেছে। আবার পাঁচশ বছর পর সেই জায়গা অতিক্রম করার সময় দেখলাম এক বিরাট প্রবাহমান নদী এবং নদীর কিনারে কয়েকজন জেলে মাছ ধরছে। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গাটি নদীতে রূপান্তরিত হলো কখন? ওরা অট্টহাসি দিয়ে বললো, আপনি কোথা থেকে নামেছেন? এটা কোন্ ধরনের প্রশ্ন করলেন? এখানে তো যুগ যুগ ধরে নদীই আছে। আমাদের বাপদাদারাও এখানে নদীই দেখেছে। পাঁচশ বছর পর আবার সেই একই জায়গা দিয়ে যাবার সময় কোন নদী দেখলাম না। দেখলাম এক বিরাট মরুভূমি যেখানে এক লোক ঘুরা ফেরা করতেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেসা করলাম, এ জায়গাটি কখন থেকে এ রকম মরুভূমিতে পরিনত হয়েছে? সে বললো এ জায়গাটা তো দীর্ঘ দিন থেকে এ রকমই আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি কোন সময় কোন নদী প্রবাহিত ছিল না? সে বললো, কক্ষনো না, আমি এ রকম দেখিনি। আমার বাপদাদাদের মুখ থেকেও কখনো শুনিনি। আবার পাঁচশ বছর পর সে জায়গা অতিক্রম করার সময় দেখলাম এক মনোরম শহর শোভা পাচ্ছে। আমি ওখানকার এক বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ শহর কখন থেকে গড়ে উঠেছে? লোকটি বললো এটা তো খুবই প্রাচীন শহর। এর আদি আমার জানা নেই। আমার বাপদাদারাও জানে না। (আজায়েবুল মখলুকাত- ১২৯ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ এ দুনিয়া পরিবর্তনশীল। এর কোন জিনিস স্থায়ী নয়। অতএব এ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে নেই। সদা পরকালের চিন্তা করা উচিত, যেখানকার প্রতিটি জিনিস স্থায়ী।

কাহিনী নং- ৬১৫
রহস্যময় ভিক্ষুক

ঈদের দিন। নঈম শেঠ ও তার সুন্দরী স্ত্রী হাসিনা বেগম মূল্যবান পোষাক পরিধান করে এক কামরায় বসে খাবারের অপেক্ষা করছিল। একটু পরে তাদের খাদেম শুকুর কামরায় প্রবেশ করে একান্ত বিনয় সহকারে বললো, হুযূর, চলুন, খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। নঈম শেঠ স্ত্রীকে বললো, চলো, খাবার খেয়ে আসি। অতপর উভয়ে যে মাত্র খেতে বসলো বাহির দরজা থেকে আওয়াজ আসলো, "বাবা, কয়েক দিনের উপবাসী। আজ ঈদের দিন। আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু খেতে দিন। আল্লাহ মঙ্গল করবে।"

ভিক্ষুকের এ আওয়াজ শুনে সম্পদের মোহে বিভোর অহংকারী নঈম শেঠ গর্জে উঠে বললো- এ অমানুষের জাত ঈদের দিনও পিছু ছাড়ে না। শুকুর, ওকে ধাক্কা দিয়ে দরজা থেকে বের করে দাও। নির্দেশ মত তা-ই করা হলো।

এরপর থেকে নঈম শেঠের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। প্রতিটি ব্যবসায় লোকসান দিতে লাগলো। গলায় গলায় ঋণ হয়ে গেল। ঋণ দাতাদের ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়লো।

ঈদের পর ছয় মাসের মধ্যে ধন-সম্পদ সব কিছু নঈম শেঠের হাত ছাড়া হয়ে গেল। ঘর দোকান সব কর্জ দাতারা দখল করে নিয়ে নিল। সে এত নিঃস্ব হয়ে গেল যে দুবেলা খাবার যোগার করাটাও তার জন্য মুশকিল হয়ে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত সে একদিন তার প্রাণ প্রিয়া সুন্দরী স্ত্রী হাসিনাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললো- প্রেয়সী, আমি জানি, তুমি আমার কথায় সীমাহীন কষ্ট পাবে। দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন হতে দেখে তুমি ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু কি করি। তোমার নঈম এখন কপর্দকহীন, অভাব অনটনে জর্জরিত। আমি উপবাস থাকতে পারি, কিন্তু তোমার উপবাস আমার কাছে অসহ্য। তাই তোমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তোমার মত রূপসী মহিলাকে তিলে তিলে না মেরে মুক্ত করে দিতে চাই। তোমাকে তিন তালাক দিলাম। তুমি ইদ্দত পালনের পর অন্যজনের সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে জীবন যাপন কর। এ কথা বলার পর উভয়ে অজোরে কান্নাকাটি করলো। অতঃপর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এ ভাবে বছর চলে গেল। পুনরায় ঈদের দিন আসলো। হাসিনা তার দ্বিতীয় স্বামী শেঠ শাকেরের সাথে খেতে বসলো। এমন সময় বাহির দরজা থেকে ভিক্ষুকের আওয়াজ আসলো-

"বাবা, কয়েক দিনের উপবাসী। আজ ঈদের দিন। আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু খেতে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করবে।"

শেঠ শাকের স্ত্রীকে বললো, প্রথমে ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে এসো, পরে আমরা খাব। স্বামীর কথামত স্ত্রী ভিক্ষুককে কিছু দিতে গিয়ে যে মাত্র বাহির দরজায় দাঁড়ানো ভিক্ষুককে দেখলো, চিৎকার দিয়ে ধুম করে মাটিতে পড়ে বেহুশ হয়ে গেল। স্বামী দৌড়ে এসে ওকে উঠিয়ে নিল। সেবাযত্ন করার পর যখন ওর হুশ ফিরে আসলো, তখন স্বামী ওকে জিজ্ঞেস করলো- ব্যাপার কি? তোমার এ অবস্থা হলো কেন?

স্ত্রী বললো, আমাকে মাফ করবেন, হৃদয় বিদারক এক দৃশ্য দেখে নিজেকে আত্মসংবরন করতে পারিনি।

স্বামী জিজ্ঞেস করলো, সে দৃশ্যটা কি?

স্ত্রী বললো, বাহির দরজায় যে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ছিল, সে হলো নঈম শেঠ। আমি ওকে এ অবস্থায় দেখে বেহুশ হয়ে গেছি।

শেঠ শাকের নঈম শেঠের নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো- তুমি ওকে কি করে চিন?

স্ত্রী অকপটে বললো, গত বছর সে ছিল আমার স্বামী। আজ থেকে এক বছর আগে এ রকম ঈদের দিনে আমরা খেতে বসে ছিলাম। সে দিনও আজকের মত এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু আফ্‌সোস। সে দিন নঈম শেঠ ওকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। সেই নঈম শেঠ আজ নিজে পরের দুয়ারে ভিক্ষা চাইতেছে।

স্ত্রীর কথা শুনার পর শেঠ শাকের বললো- এ দুনিয়া বড় বেঅফা। এর উপর কোন ভরসা নেই। এ দুনিয়া রাতারাতি ভিক্ষুককে ধনী এবং ধনীকে ভিক্ষুকে পরিনত করে। তুমি আমার কথা শুনলে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবে। তুমিতো নঈম শেঠকে চিনতে পেরেছ কিন্তু আমাকে চিনতে পারনি। আমি হলাম সেই ভিক্ষুক, যাকে গত বছর ঈদের দিনে নঈম শেঠ ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। এ কথা

শুনে হাসিনা বেগম পুনরায় বেহুশ হয়ে গেল। (হেকায়েতে সাদী)

সবক ঃ দুনিয়া বড় বেঅফা। এর উপর ভরসা করতে নেই। ধন দৌলত ক্ষনস্থায়ী। একে নিয়ে গর্ব করতে নেই। ধন দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে গরীব, অভাবীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা মোটেই উচিত নয়।

কাহিনী নং- ৬১৬
পার্থিব মোহের পরিনতি

একবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এক সফরে বের হয়েছিলেন। পথে এক ইহুদী তাঁর সফর সঙ্গী হয়েছিল। সেই ইহুদীর কাছে ছিল দুটি রুটি আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে ছিল এক রুটি। কিছু দূর যাওয়ার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইহুদীকে বললো- চলো, আমরা এক সাথে বসে রুটি খাই। ইহুদী রাজি হলো, কিন্তু যখন দেখলো যে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে একটি রুটি, তখন সে আফসোস করলো এবং মনে মনে বললো যে এক সাথে খেতে সম্মত হওয়াটা ঠিক হয়নি। যখন খেতে বসলো, ইহুদী একটি রুটি বের করলো। ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে বললেন, তোমার কাছে তো দুটি রুটি ছিল, আর একটি কোথায়? ইহুদী বললো, আমার কাছে একটি রুটিই ছিল, দুটি কখন ছিল? ঈসা আলাইহিস সালাম আর কিছু বললেন না, রুটি খেয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। পথে এক অন্ধ লোকের দেখা হলো। ঈসা আলাইহিস সালাম ওর জন্য দুআ করলে, সে সুস্থ হয়ে যায়। এ মুজজা দেখিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম ইহুদীকে বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমার দুআয় এ অন্ধকে সুস্থ করে দিয়েছেন। বল, তোমার অপর রুটিটা কোথায়? সে বললো- খোদার কসম, আমার কাছে মাত্র একটি রুটি ছিল। আর কোন রুটি ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে চলো, পুনরায় যাত্রা দিলেন। কিছু দূর যাবার পর একটি হরিন দেখলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম হরিনটাকে ডাকলে কাছে এসে গেল, তিনি সেটাকে জবেহ করলেন, মাংস ভুনা করে উভয়ে খেলেন। অতঃপর হাড়গুলো এক জায়গায় রেখে قم باذن الله (আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও) বলে লাঠি দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে হাড়গুলো হরিনের আকৃতি ধারন করে জীবিত হয়ে গেল। এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে বললেন, তোমাকে সেই খোদার কসম, যিনি আমাদেরকে

এ হরিন খাওয়ালেন এবং পুনরায় সেটাকে জীবিত করে দিলেন, বল সেই রুটিটি কোথায়? সে আবার শপথ করে বললো- আমার কাছ একটি রুটিই ছিল। আবার পথ চলতে চলতে একটি ছোট শহরে গিয়ে পৌছলেন। ওখানে ঈসা আলাইহিস সালাম অবস্থান করলেন। এক দিন সুযোগ পেয়ে ইহুদী তাঁর লাঠিটা চুরি করে নিয়ে নিল এবং মনে মনে দারুন খুশী হলো যে সে এ লাঠির আঘাতে মৃতকে জীবিত করবে। সে শহরে ঘোষনা করে দিল যে সে মৃতকে জীবিত করতে পারে। এ ঘোষনা শুনে লোকেরা ওকে শহরের অসুস্থ প্রশাসকের কাছে নিয়ে গেল। সে যাওয়া মাত্র প্রশাসকের মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করলো। এতে প্রশাসক মারা যায়। সে লোকদেরকে বললো, দেখ, আমি ওকে জীবিত করতেছি। এ বলে লাঠি দ্বারা পুনরায় আঘাত করলো এবং قم باذن الله (আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও) বললো, কিন্তু জীবিত হলো না। সে ঘাবড়ে গেল। লোকেরা ওকে ফাঁসীর কাষ্টে উঠালো। সেই সময় ঈসা আলাইহিস সালাম তথায় গিয়ে পৌছলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রশাসককে আমি জীবিত করে দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও। অতপর তিনি قم باذن الله বলার সাথে সাথে প্রশাসক জীবিত হয়ে গেল। লোকেরা ইহুদীকে ছেড়ে দিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর কসম, যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, এবার সত্য কথা বল, সেই রুটিটা কোথায়? সে আবার কসম করে বললো যে ওর কাছে দ্বিতীয় কোন রুটি ছিল না। আবার যাত্রা দিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনটি স্বর্ণের ইট খুজে পেলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বললো এখান থেকে একটি আমার একটি তোমার এবং অবশিষ্টটি ওর, যে সেই দ্বিতীয় রুটিটি খেয়েছে। ইহুদী বললো, খোদার কসম, সেই দ্বিতীয় রুটিটি আমিই খেয়ে ছিলাম। ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে ইট তিনটাই দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এবার তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। সে ইট নিয়ে বেশীদূর যেতে পারে নি, ইটসহ মাটির নিচে তলিয়ে গেল। (নুজহাতুল মাজালিস - ২০৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ ইহুদীরা বড় জঘন্য মিথ্যুক। ওরা দুনিয়ার মোহে বিভোর। ওদের উপর আল্লাহর অনেক গজব নাজিল হয়েছে। এখনও ইহুদীরা দুনিয়ার মোহে বিশ্বময় অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। ওরা মুসলমানদের চির শত্রু। কোন অবস্থাতেই ওদেরকে বিশ্বাস করতে নেই।

কাহিনী নং- ৬১৭

দুনিয়াবী সম্পদের লিপ্সা

তিন বন্ধু সফর কালে তিনটি স্বর্ণের ইট খুঁজে পেল। প্রত্যেকে সানন্দে একটি করে নিয়ে নিল। কিছুদূর যাবার পর তাদের মধ্যে একজন নিকটস্থ গ্রাম থেকে খাবার আনতে গেল। সে মনে মনে ভাবলো খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে নিয়ে গেলে, সে খাবার খেয়ে আমার সাথীদ্বয় মারা যাবে। ফলে ইট তিনটির মালিক আমি হয়ে যাব। সে তাই করলো। এ দিকে তার সাথীদ্বয় পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে সে খাবার নিয়ে আসলে, ওরা ওকে হত্যা করে ফেলবে। ফলে ওরা দু'জন তিন ইটের মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর সে যখন খাবার নিয়ে আসলো, এরা অতর্কিত হামলা করে ওকে হত্যা করে ফেললো। এরপর এরা তৃপ্তি সহকারে ওর আনিত খাবার খেল। ফলে ওরাও মারা গেল এবং ইট তিনটি সেখানে পড়ে রইলো। (নুজহাতুল মাজালিস)

সবক ঃ দুনিয়ার লিপ্সা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষ দুনিয়ার জন্য কত ধোকাবাজি চালবাজি করে থাকে। কিন্তু কেউ স্থায়ী হতে পারে না। অথচ দুনিয়া অটল রয়ে যায়। তাই এ দুনিয়ার জন্য ঝগড়া বিবাদ করা বড় বোকামী।

কাহিনী নং- ৬১৮

দুনিয়ার সম্পদ

এক ব্যক্তি প্রায় সময় ঘুমে বিছানায় প্রশ্রাব করতো। এক দিন ওর স্ত্রী বললো, আপনার কি হলো যে এ ভাবে প্রতি দিন বিছানায় প্রশ্রাব করতেছেন? সে বললো, আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখি। সে আমাকে প্রায় সময় ভ্রমনে নিয়ে যায়। যখন আমার প্রশ্রাবের হাজত হয়, সে আমাকে এক কিনারে বসায়ে বলে এখানে প্রশ্রাব কর। আমি সেখানে প্রশ্রাব করি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি আমি বিছানায় প্রশ্রাব করে দিয়েছি। ওর স্ত্রী বললো, শয়তানতো জ্বীনদের বংশধর। ওদেরকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ওর সাথে যখন আপনার নিয়মিত সাক্ষাত হয়, আপনি তো ওকে বলতে পারেন- আমরা খুব অভাব অনটনে আছি, আমাদেরকে যেখান থেকে

পার টাকা এনে দাও। স্বামী বললো খুবই ভাল কথা, এবার স্বপ্নে দেখা হলে নিশ্চয়ই বলবো। যথাসময়ে স্বপ্নে শয়তানের দেখা হলে, সে বললো, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পার। কিন্তু কখনো করলে না। শয়তান বললো, তুমিতো এ কথা আগে কখনো আমাকে বলনি। ঠিক আছে আমার সাথে চল। ওকে এক জায়গায় নিয়ে গেল এবং ওখান থেকে এক বিরাট টাকার বস্তা ওর মাথার উপর উঠিয়ে দিল। টাকার বস্তাটা ওর কাছে এত ভারী মনে হলো যে এর ফলে ওর পেট থেকে পায়খানা বের হয়ে আসে। ঘুম ভাঙ্গার পর দেখা গেল বিছানায় পায়খানা, টাকার কোন নাম গন্ধ নেই। (মাহে তৈয়্যবা- ৫৪)

সবক ঃ দুনিয়াটা হচ্ছে স্বপ্ন জগতের মত আর দুনিয়াদারেরা হচ্ছে স্বপ্ন দর্শনকারীর মত এবং দুনিয়ার সম্পদ হচ্ছে পায়খানার মত। অলসতার স্বপ্নে যারা বিভোর, তারা জানে না কি সংগ্রহ করছে। যখন চোখ খুলবে, তখন দেখবে গুনার স্তুপ ছাড়া আর কিছু নেই।

কাহিনী নং- ৬১৯

গাধা ও শাহী ঘোড়া

এক গরীব লোক তার দুর্বল গাধাকে নিয়ে একবার বাদশাহের ঘোড়া শালায় গিয়েছিল। গাধা ঘোড়াগুলোকে খুব মোটা তাজা দেখে এবং ও গুলো দেখাশুনার দায়িত্বে অনেক লোককে নিয়োজিত দেখে, নিজের অবস্থার প্রতি খুবই দুঃখ হলো। এবং মনে মনে আশা করতে লাগলো, আহ! আমার অবস্থা যদি এ রকম হতো। ঠিক সে সময় যুদ্ধের ডংকা বেজে উঠলো এবং ঘোড়া গুলোকে যুদ্ধের ময়দানে যেতে হলো। যখন ঘোড়া গুলো যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসলো তখন গাধা দেখলো যে কোন ঘোড়া ক্ষত বিক্ষত, কোন ঘোড়া রক্তে রঞ্জিত, কোন ঘোড়ার শরীরে তীর বিদ্ধ এবং কোন ঘোড়া মৃত্যু মুখে পতিত। এ দৃশ্য দেখে গাধা বললো, হে আল্লাহ, আমি যে রকম আছি, সে রকম ভালই আছি। ওদের মত হতে চাইনা। (মাহে তৈয়্যবা- ৫৪)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে যে অবস্থায় রেখেছে সেটাই ভাল।

কাহিনী নং- ৬২০

বাঘের চামড়া জড়ানো গাধা

এক ব্যক্তির এক গাধা রোগাক্রান্ত হয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং এর দ্বারা কোন কাজ করানো যাচ্ছিল না। ফলে লোকটি বাধ্য হয়ে গাধাটি জংগলে ছেড়ে দিল। পাখী ও পোকা মাকড়ের কামড়ে ওর ক্ষত বিক্ষত শরীর আরও শোচনীয় হয়ে গেল। এক পথিক গাধাটির এ অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে একে ওর ঘরে নিয়ে গেল। ওর কাছে বাঘের একটি চামড়া ছিল। সে চামড়াটি গাধার শরীরের উপর দিয়ে দিল এবং চামড়ার মুখের অংশটি গাধার মুখে লাগিয়ে দিল। অতপর গাধাটিকে পুনরায় জংগলে ছেড়ে দিল। এবার গাধাটি কোন উপদ্রব ছাড়া স্বাধীনভাবে জংগলে চরতে লাগলো। পশু পাখী সবাই ওকে বাঘ মনে করে ভয় করতে লাগলো। কেউ কাছে ঘেঁষতে ছিল না। এ ভাবে জংগলের বাদশাহী লাভ ও স্বাধীন ভাবে বিচরন করার সুযোগ পেয়ে গাধাটি অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেল এবং মোটা তাজা হয়ে গেল। একদিন মনের আনন্দে গাধাটি জোর গলায় ডাক দিল। এ আওয়াজ শুনে জংগলের সমস্ত পশু পাখীরা অবাক হয়ে গেল এবং বুঝতে পারলো যে এটা ছদ্ম বেশী বাঘ। বাঘের চামড়া পরিধান করে এতদিন আমাদেরকে ধোকা দিযেছে। অতপর সবাই মিলে ওর আবরনটা খুলে ফেলে দিয়ে ওকে ওর জায়গায় পাঠিয়ে দিল। (মাহে তৈয়বা - ৫৪)

সবক ঃ আজকাল অনেক ছদ্মবেশী বাতিল ফিরকা ইসলামের মুখোস পরে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে থাকে। তাদের থেকে হুশিয়ার থাকা উচিৎ। এ সব ছদ্মবেশী মুসলমানদের মুখে যখন নবীর শানে বেআদবী এবং সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজায সম্পর্কে যা-তা বলতে শুনবে, তখন বুঝতে হবে এরা বাঘের চামড়া জড়ানো গাধা।

কাহিনী নং- ৬২১

হালুয়া

এক খৃষ্টান, এক ইহুদী ও এক মুসলমান এক সাথে মিলে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিল। রমযান শরীফের মাস হওয়ায় মুসলমান লোকটি রোযাদার ছিল। সন্ধ্যা

ঘনিয়ে আসায় তারা পাশের একটি গ্রামের মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিল। মসজিদের এক প্রতিবেশী তারা তিনজনকে মুসলমান ও রোযাদার মনে করে উন্নত মানের হালুয়া তৈরী করে তাদের জন্য নিয়ে আসলো। খৃষ্টান ও ইহুদী লোভনীয় হালুয়া দেখে পরস্পর পরামর্শ করলো যে এ মুহূর্তে খেলে রোযাদার মুসলমান সিংহভাগ খেয়ে ফেলবে। এমন কোন ফন্দি করা দরকার, যাতে মুসলমান সাথীকে বঞ্চিত করে সব হালুয়া আমরা দুজনে খেতে পারি। অতপর মুসলমান সাথীকে ডেকে বললো- আমাদের অভিমত হচ্ছে হালুয়াটা এ মুহূর্তে না খেয়ে রেখে দেয়া হোক এবং রাত্রে যে সবচে ভাল স্বপ্ন দেখবে, সেই একাই হালুয়ার অধিকারী হবে। মুসলমান লোকটি তাদের দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করে তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিল। এ সিদ্ধান্তের পর হালুয়ার পাত্রটা এক কিনারে যত্ন করে রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। সেহেরীর সময় মুসলমান সাথীটি যথারীতি ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং দেখলো যে তার সাথীদ্বয় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এ সুযোগে সে হালুয়ার পাত্রটা নিয়ে সব হালুয়া খেয়ে নিল এবং রোযার নিয়ত করে পুনরায় শুয়ে পড়লো। সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা একে একে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে লাগলো। এ স্বপ্ন গুলো নিছক হালুয়া খাওয়ার লিপ্সায় মনগড়া তৈরী করেছিল। প্রথমে ইহুদী বললো, রাত্রে আমি স্বপ্নে আমাদের নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে বললেন, চলো, আমার সাথে তুর পাহাড়ে যাই। অতঃপর আমি তাঁর সাথে তুর পাহাড়ে গেলাম এবং চারিদিকে ইচ্ছেমত ঘুরলাম। এর থেকে উত্তম স্বপ্ন আর কি হতে পারে? এর পর খৃষ্টান লোকটি বললো- রাত্রে আমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আমার কাছে তশরীফ এনে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন- উঠ, আমার সাথে আসামনে চল, যেখানে আমি থাকি। আমি সানন্দে আমার নবীর সাথে আসমানে চলে গেলাম। এটা তুর পাহাড়ে যাওয়ার থেকে অধিক তাৎপর্যময় নয় কি?

এবার মুসলমানের পালা। সে বললো- সেহেরীর সময় আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তশরীফ আনেন। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বলেন, ওহে আমার উম্মত, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠ, সেহেরীর সময় হয়ে গেছে, হালুয়াটুকু খেয়ে নাও। নবীর নির্দেশ পালনার্থে আমি হালুয়াটুকু খেয়ে নিলাম। খৃষ্টান ও ইহুদী এ স্বপ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বললো, সত্যি সত্যি কি তুমি হালুয়া খেয়ে ফেলেছ? সে বললো, কি করা নবীর হুকুম আমান্য

করাটাতো কুফরী। ওরা বললো, বন্ধু, এ ভাবে একাকী না খেয়ে আমাদেরকেতো ডাকতে পারতে। মুসলমান বন্ধুটি বললো, আমি তোমাদেরকে অনেক ডাকাডাকি করেছি। কিন্তু তোমরা একজন চলে গেছে তুর পাহাড়ে আর একজন চলে গেছ আসমানে। তাই বাধ্য হয়ে একাকীই খেতে হলো। (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ ইহুদী-খৃষ্টান কখনো মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু নয়। এরা বড় ধোকাবাজ। এদের ধোকা থেকে রক্ষা পেতে হলে সদা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হয়। নতুবা ওদের খপ্পর থেকে বাঁচা বড় মুশকিল।

কাহিনী নং- ৬২২

টাকার থলি

এক জায়গায় বসে কয়েকজন চোর আড্ডা মারছিল। ওদের পাশ দিয়ে টাকা ভর্তি থলি নিয়ে এক স্বর্ণকারকে যেতে দেখে ওদের একজন বললো, দেখ, এ টাকার থলিটা আমি কি ভাবে নিয়ে আসি- এ বলে সে স্বর্ণকারের পিছু নিল এবং স্বর্ণকারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। স্বর্ণকার ঘরে প্রবেশ করে থলিটা তাকে রেখে চাকরানীকে বললো আমার খুব প্রস্রাবের হাজত হয়েছে, তুমি এক লোটা পানি নিয়ে উপরে আস- এ বলে স্বর্ণকার উপরে চলে গেল। চাকরানীও পানি নিয়ে উপরে গেল। এ সুযোগে চোর ঘরে ঢুকে থলিটা নিয়ে সাথীদের মাঝে ফিরে আসলো এবং সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করলো। সাথীরা ওর কথা শুনে বললো, তুমি কাজটা ঠিক করনি। সেই নিরিহ গরীব চাকরানীটাই জুলুমের শিকার হবে। কারণ স্বর্ণকার নিঃসন্দেহভাবে থলির জন্য ওকেই অভিযুক্ত করবে। এটা ঠিক হয়নি। থলি চোর বললো, তাহলে তোমরা কি বলতে চাও? ওরা বললো- আমরা চাই চাকরানীটা মারপিট থেকে বেঁচে থাক এবং থলিটাও আমার পেয়ে যাই। সে বললো, ঠিক আছে, তাই হবে। সে আবার টাকার থলিটা নিয়ে স্বর্ণকারের ঘরে গেল এবং দেখালো যে স্বর্ণকার ঠিকই চাকরানীকে খুব জোরে মারছে। চোর দরজার কড়া নাড়লো। স্বর্ণকার ভিতর থেকে বললো- কে? চোর বললো, আমি আপনার প্রতিবেশী দোকানদারের কর্মচারী। স্বর্ণকার দরজা খুলে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো- কি জন্য এসেছ? চোর বললো, আমার মালিক আপনাকে সালাম বলেছেন। আপনার স্বরণ শক্তি কমে গেছে। আপনি আপনার টাকার থলিটা

আমাদের দোকানে ফেলে এসেছেন। ভাগ্য ভাল, আমরা না দেখলে, থলিটা অন্য কেউ নিয়ে যেত। স্বর্ণকার থলিটা দেখা মাত্র চোরের হাত থেকে নিয়ে নিল এবং বললো ঠিকইতো, এটা আমার থলি। চোর বললো, আপনি থলিটা আমার হাতে দিন এবং ঘরে গিয়ে একটি কাগজে লিখে আনুন যে টাকার থলিটা আমার থেকে বুঝে পেয়েছেন। স্বর্ণকার টাকার থলিটা ওর হাতে দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র লিখার জন্য ঘরে ঢুকলো। এ সুযোগে চোর থলি নিয়ে ফিরে এসে গেল। (কিতাবুল আযকিয়া- ৩৮৫ পৃঃ)

সবক ঃ এ দুনিয়াটি একটি ধোকা। এর ধোকায় পড়ে অনেকেই সর্বশান্ত হচ্ছে। এ দুনিয়ায় অনেক বড় বড় ধোকাবাজ, বাটপার বিরাজ করে। তাই সদা সতর্ক থাকা উচিৎ।

কাহিনী নং- ৬২৩

বিদ্যাসাগর

কাজী আবু বকর বিন আরবী হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে জ্ঞান অর্জন করে স্বীয় দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। মাঝ পথে নৌকা যোগে সাগর পাড়ি দেয়ার সময় হটাৎ সাগরের ঢেউগুলো উত্থাল হয়ে উঠে এবং নৌকা দুলতে থাকে। কাজী আবু বকর সাগরকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে সাগর, সাবধান! তোমার উপর দিয়ে তোমার মত আর এক সাগর যাচ্ছে (কাজী সাহেব স্বীয় জ্ঞানের উপর গর্ব করে নিজেকে সাগর বলেছেন)। এ কথা বলার সাথে সাথে সাগর থেকে অদ্ভুত আকৃতির এক জানোয়ার আবির্ভূত হয়ে নৌকা আগলে ধরে জিজ্ঞেস করলো- আপনি যখন এত বড় আলিম, বলুন দেখি, যে স্ত্রীর স্বামী খোদার গজবে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে স্ত্রী কত দিন ইদ্দত পালন করবে? কাজী সাহেব লা-জবাব হয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে পুনরায় ইমাম গাজ্জালীর কাছে ফিরে গেলেন এ মাসআলা জানার জন্য। ইমাম গাজ্জালী এ মাসআলা শুনার সাথে সাথে জবাব দিলেন যে লোকটি যদি কোন প্রাণীর আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে লোকটির স্ত্রীর জন্য তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদ্দত প্রয়োজ্য হবে। কেননা সেই ব্যক্তির প্রাণ বহাল আছে। আর যদি রূপান্তরিত হয়ে পাথরে পরিনত হয়ে যায়, তাহলে ওর স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিধবা মহিলার ইদ্দত প্রয়োজ্য হবে। কারণ সেই ব্যক্তির প্রাণ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মাসআলাটি জানার পর কাজী সাহেব

পুনরায় যাত্রা দিলেন এবং সাগর পাড়ি দেয়ার সময় পুনরায় সেই জানোয়াবের দেখা হলো এবং কাজি সাহেবের মুখে প্রশ্নের উত্তর শুনে বললো- বিদ্যাসাগর দাবী করলে ইমাম গাজ্জালীই করতে পারেন, আপনি নন। (নুজহাতুল মাজালিস- ২২ পৃঃ ২জিঃ)

সবক ঃ জ্ঞান বড় নিয়ামত। এটা নিয়ে গর্ব করতে নেই। যে কোন বিষয়ে জটপট জবাব দেয়া ঠিক নয়। কোন বড় আলিম থেকে জেনে নেয়া উচিত।

কাহিনী নং- ৬২৪

হারুনুর রশীদ ও তাঁর বাঁদী

কবি আবু নওয়াস বাদশাহ হারুনুর রশীদের শানে একটি কবিতা লিখে তাঁকে শুনানোর জন্য তাঁর দরবারে যান। সেই দিন হারুনুর রশীদ খালেসা নামের তাঁর এক সুন্দরী বাঁদীর পাশে বসা ছিলেন এবং বাঁদীর গলায় একটি মূল্যবান হার পরিয়ে সেটা দেখে দেখে খুবই তৃপ্তিবোধ করছিলেন। কবি আবু নওয়াস কবিতা শুনায়ে কিছু বখশীশ লাভ করার আশায় এসেছিলেন। কিন্তু হারুনুর রশীদ সেই বাঁদী ও ওর গলায় পরিহিত সেই হারের প্রতি এত আকৃষ্ট ছিলেন যে কবির প্রতি একটু দৃষ্টিপাতও করেননি। কবি আবু নওয়াস মনঃক্ষুন্ন হয়ে দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন এবং শাহী দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় দরজায় এ কবিতা লিখে আসেন।

لقد ضاع شعرى على بابكم

كما ضاع عقد على خالصة

অর্থাৎ আমার কবিতা তোমার দরজায় এমন ভাবে বেমানান হয়েছে, যে ভাবে খালেসার গলায় মূল্যবান হার বেমানান হয়েছে।

হারুনুর রশীদ যখন জানতে পারলেন যে কবি আবু নওয়াস যাবার সময় দরজায় এ রকম কবিতা লিখে গেছেন তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে ওকে ডেকে পাঠালেন। কবি আবু নওয়াস যথাসময়ে হাজির হলেন। তার দরবারে প্রবেশ করার সময় দরজায় লিখিত তাঁর কবিতার পংক্তিদ্বয়ের ضاع শব্দের ع (আইন) বর্ণের নিচের অংশ মুছে দিয়ে ء (হামজা) বর্ণের আকৃতি করে দিলেন, এবং কবিতাটি

এ রকম হয়ে গেল-

لقد ضاء شعرى على بابكم

كما ضاء عقد على خالصة

অর্থাৎ আমার কবিতা তোমার দরজায় এ রকম শোভা পেয়েছে, যে রকম মূল্যবান হার খালেসার গলায় শোভা পেয়েছে।

কবি আবু নওয়াস দরবারে প্রবেশ করলে হারুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করেন- আপনি দরজায় এ ধরনের গর্হিত কবিতা কেন লিখেছেন? কবি আবু নওয়াস বললেন, কৈ, আমিতো প্রশংসামূলক কবিতা লিখেছি। আপনি নিজেই দেখতে পারেন। বাদশাহ দরজায় গিয়ে দেখেন যে কবিতাটি ঠিকই প্রশংসামূলক। এতে বাদশাহ খুশী হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করলেন। (নফহাতুল ইয়াসীন)

সবক ঃ জ্ঞানী ব্যক্তিকে কেউ সহজে আটকাতে পারে না। তাঁদের জ্ঞানের বদৌলতে তাঁরা সব জায়গায় সমাদৃত হয়ে থাকেন।

কাহিনী নং- ৬২৫

বনান তোফাইলী

আরবের প্রসিদ্ধ রসিক ব্যক্তি বনান তোফাইলী বড় ভোজন বিলাশী ছিল। এক দিন সে কোন এক আমীরের দরবারে দাওয়াত খেতে গেল। আমীর ওকে ওনার পাশে বসালেন এবং খাদেমকে খাবার পরিবেশন করতে বললেন। খাদেম টুকরো টুকরো করা শুকনো হালুয়ার পাত্র ওনাদের সামনে এনে রাখলো। আমীর এক টুক্‌রা নিয়ে বনানকে দিলেন।

সে সেটা খেয়ে বললো- ان الهكم لواحد (নিশ্চয়ই তোমাদের খোদা এক) আমীর পুনরায় দু'টুকরা দিলেন। বনান সে দু টুক্‌রা খেয়ে এ আয়াত পড়লো- ارسلنا اليهم اثنين (আমি ওদের কাছে দু'জন নবী পাঠিয়েছি।)

আমীর তিন টুকরা দিলে বনান সে গুলো খেয়ে এ আয়াত পড়লো فعززنا بثالث (অতঃপর আমি তিন দ্বারা ইজ্জত বৃদ্ধি করেছি।)

আমীর চার টুকরা দিলে বনান এ আয়াত পড়লো- فخذ اربعة من الطير (চারটি পাখী লও) আমীর পাঁচ টুকরা দিলে সে

বললো ويقولون خمسة (ওরা বলে পাঁচ)

আমীর ছয় টুকরা দিলে সে এ আয়াত তেলাওয়াত করে خلق السموات والارض فى ستة ايام (আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে জমীন আসমান সৃষ্টি করেন।)

আমীর সাত টুকরা দিলে সে এ আয়াত পাঠ করে- وبنينا فوقكم سبعا شدادا (আমি তোমাদের উপর সাত আসমান তৈরী করে দিয়েছি।)

আমীর আট টুকরা দিলে সে বলে ان تاجرنى ثمانى حجج (তোমরা আট বছর আমার চাকুরী কর)

আমীর নয় টুকরা দিলে সে এ আয়াত তেলাওয়াত করে- وكان فى المدينة تسعة رهط (মদীনায় নয়টি গৌত্র ছিল।)

আমীর দশ টুকরা দিলে সে এ আয়াত পাঠ করে- تلك عشرة كاملة (এটি দশের পরিপূর্ণ সংখ্যা)

আমীর এগার টুকরা দিলে সে বলে احد عشر كوكبا (এগার নক্ষত্র)

আমীর বার টুকরা দিলে সে বলে ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (আল্লাহ তাআলার কাছে মাসের সংখ্যা হচ্ছে- বার)

আমীর এ ভাবে দিতে দিতে অসহ্য হয়ে হালুয়ার পাত্রটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে বনান তোফাইলী জটপাট এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলো- وَارسلنا الى مائة الف او يزيدون (আমি ওকে এক লাখ বা এর থেকে অধিকের দিকে পাঠিয়েছি।(লুলুশ শহহে ৪৮ পৃঃ)

সবক ঃ বদমযহাব ও বদআকীদার লোকেরা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদার সমর্থনে বয়ান তোফাইলীর মত অহরহ কুরআনের আয়াত পাঠ করে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তাদের ব্যাপারে সদা সজাগ থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৬২৬

কুরআনের অপপ্রয়োগ

একদল খাদক কোন এক জায়গায় দাওয়াত খেতে গিয়েছিল। দাওয়াতকারী একটি খুব বড় থালার চারি দিকে ভাত রেখে মাঝখানে ঘি ঢেলে দিল। অতঃপর থালাটা ওদের সামনে দিল।

ওদের মধ্যে এক জন গ্রাস উঠায়ে ঘিয়ে ফেলে দিল এবং- فكبكبوا فيهاهم والغاؤن (অতপর উপুড় করে ওদেরকে ও অন্য সব বিপদগামীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

দ্বিতীয় জন- اذا القوا فيها سمعوالها شهيقا وهى تفور (যখন ওদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন এর বিকট আওয়াজ শুনবে এবং সেটা টকবক করতে থাকবে) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল। তৃতীয় জন- اخرقتها لتغرق اهلها। (তুমি কি নৌকাকে এ জন্য ভেঙ্গেছ যে এর আরোহীগণ যেন ডুবে যায়।) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

চতুর্থ জন انا نسوق الماء الى الارض الجوز (আমি পানি শুষ্ক জমীনের দিকে নিয়ে যাই) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

পঞ্চম জন فيهما عينان تجريان (ঐ দু বাগানে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে দিল।

ষষ্ঠ জন فيهما عينان نضاختان (এ দু বাগানে দুটি ঝর্ণা উতলিয়ে উঠতে থাকবে) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

সপ্তম জন فا لتقى الماء على امر قدقدر (অতঃপর পানি একাকার হয়ে গেল, সে কাজে যেটার জন্য নিদ্ধারিত হয়েছিল) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

অষ্টম জন, فسقناه الى بلد ميت (আমি পানি এমন শহরে পৌছিয়েছি, যার জমীন মৃত ছিল) বলে ঘি নিজের দিকে টেনে নিল।

নবম জন, وقيل يا ارض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى (নির্দেশ দেয়া হলো- হে জমীন নিজের পানি শুষে নাও এবং হে আসমান উঠিয়ে নাও) বলে ঘি সব ভাতে মিশিয়ে দিল। (কিতাবুল আযকিয়া ৭৫ পৃঃ)

সবক ঃ কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে মানুষকে ঠকানো অনেকের অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। বাতিল পন্থীরাও তাদের ভ্রান্ত আকীদার সমর্থনে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল দিতে চেষ্টা করে থাকে। এ জন্য কুরআন পাক নিজেই ঘোষনা করেছেন- ويضل به كثير অর্থাৎ অনেক লোক কুরআন পড়েও গুমরাহ হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৬২৭
মুরগী বন্টন

এক বেদুইন শহরে এসে এক আরব্য বাসিন্দার কাছে গেলে, সে ওকে মেহমান হিসেবে স্থান দেয়। আরব্য লোকটির পরিবারে ছিল এক স্ত্রী, দু পুত্র ও দু মেয়ে। সে এক বিরাট মুরগী ফার্মের মালিক। সে স্ত্রীকে বললো- নাস্তা হিসেবে একটি মুরগী ভুনে নিয়ে এসো। মুরগী ভুনে নিয়ে আসলে, মেহমানসহ সবাই এক সাথে খেতে বসলেন। শহুরে লোকটি ভুনা মুরগীটি মেহমানের সামনে রেখে রসিকতার ছলে বললো- আপনি সবাইকে বন্টন করে দিন। মেহমান বললো- বন্টন করার কোন উত্তম পদ্ধতি আমার জানা নেই। তবে আপনারা সানন্দে বললে আমি বন্টন করতে রাজি আছি। সবাই বললো, আমরা রাজি, আপনি বন্টন করুন। তখন সে মুরগীর মাথা ছিড়ে ঘরের কর্তাকে দিল এবং বললো আপনি হচ্ছেন পরিবারের মাথা। তাই মাথাটা আপনারই প্রাপ্য। অতঃপর দু'বাহু ছিঁড়ে দু'ছেলেকে, দু'পা ছিড়ে দু'মেয়েকে এবং পাছাটা গৃহকর্ত্রীকে দিয়ে পুরো মুরগীটা নিজের ভাগে রাখলো। পর দিন গৃহকর্তা পাঁচটি মুরগী ভুনে এনে দস্তরখানায় রাখলো এবং মেহমানকে বন্টন করার জন্য বললো, মেহমান বললো- আমার গত কালের বন্টন

সম্ভবতঃ আপনাদের পছন্দ হয় নি। আজ আপনারাই বন্টন করুন। গৃহকর্তা বললো- না না আমরা অসন্তুষ্ট হইনি, আপনিই বন্টন করুন। সে বললো, ঠিক আছে, আমি বন্টন করে দিচ্ছি, তবে জোড় বন্টন, নাকি বেজোড় বন্টন করবো? সবাই বেজোড় বন্টন করতে বললে, সে স্বামী স্ত্রীকে একটি মুরগী, দু'ছেলেকে একটি মুরগী এবং দু' মেয়েকে একটি মুরগী দিয়ে বললো- প্রত্যেক ভাগে দুই আর এক মিলে তিন হলো এবং দুটি মুরগী নিজের ভাগে রেখে বললো আমার ভাগেও এক আর দুই মিলে হলো তিন। অতএব সমান ভাবে বেজোড় বন্টন হয়ে গেল।

সবাই যখন ওর ভাগে রক্ষিত দু'মুরগীর দিকে থাকাচ্ছিল, সে বললো- আমার এ বেজোড় বন্টন আপনাদের পছন্দ না হলে আমি জোড় বন্টন করে দিতে পারি। সবাই বললো, ঠিক আছে জোড় বন্টন করুন। সে মুরগী গুলো ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় গৃহকর্তা ও দু'ছেলেকে একটি মুরগী দিল এবং গৃহকর্ত্রী ও দু মেয়েকে একটি মুরগী দিল এবং নিজের ভাগে তিন মুরগী রেখে বললো প্রত্যেক ভাগে সমান সমান চার হয়েছে। অতপর সে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বললো- হে আল্লাহ! তোমার বড় ইহসান, তুমি আমাকে এ বন্টন করার জ্ঞান দান করেছ। (কিতাবুল আসকিয়া- ১৩২ পৃঃ)

সবক ঃ অনেক সময় রসিকতার ফল উল্টা হয়ে থাকে। তাই যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে হাস্য-রসিকতা করতে নেই।

কাহিনী নং- ৬২৮
চার মেধাবী ভাই

নযার বিন মায়াদ নামে এক বড় নেতা ছিলেন। তাঁর ছিল চার ছেলে, যাদের নাম ছিল যথাক্রমে মজর, রবিয়া, আয়াদ ও আনমার। নযার মৃত্যুর আগে তাঁর চার ছেলেকে ডেকে বললেন- আমার সম্পত্তির অমুক জিনিস মজরের নামে, অমুক জিনিস রবিয়ার নামে, অমুক জিনিস আয়াদের নামে এবং অমুক জিনিস আনমারের নামে বন্টন করে রাখলাম। আমার মৃত্যুর পর আমার এ বন্টনের মধ্যে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তোমরা নজরানের বাদশাহ আফি বিন রফি জরহামীর শরনাপন্ন হইও। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্টনে সমস্যা দেখা দিলে বাদশাহ আফির মতামত গ্রহনের জন্য চার ভাই একত্রে নজরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যাত্রা

পথে তারা উট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একটি ক্ষেত দেখলো। মজর বললো, যে উট এ ক্ষেত খেয়েছে, সেটা কানা ছিল। রবিয়া বললো, সেটা লেংড়াও ছিল। আয়াদ বললো, সেটা আলস প্রকৃতিরও ছিল। আনমার বললো- সেটার দাঁতও দুর্বল ছিল। এরই মধ্যে সেই উটের মালিক উটের সন্ধানে ওদের কাছে এসে উটের কথা জিজ্ঞেস করলো। মজর বললো- তোমার উট কি কানা? সে বললো, হ্যাঁ। আয়াদ বললো- তোমার উট কি আলস প্রকৃতির? সে বললো- হ্যাঁ। আনমার বললো- তোমার উটের দাঁত কি দুর্বল? সে বললো- হ্যাঁ। রবিয়া বললো- তোমার উটতো মনে হয় লেংড়াও। সে বললো- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এবার বলুন আমার উট কোথায়? ওরা চার ভাই বললো- খোদার কসম আমরা তোমার উট দেখি নাই। উটের মালিক বিস্মিত হয়ে বললো- আমার উটের হুবহু বর্ণনা দেয়ার পর দেখেন নাই বলাটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত উটের মালিকও ওদের সাথে নজরান পৌঁছলো এবং বাদশাহের কাছে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো- তারা আমার উটের চিহ্নগুলো অবিকল বলছে কিন্তু উট দেখার কথা অস্বীকার করছে। বাদশাহ ওদেরকে উট না দেখে চিহ্নগুলোর কথা কি করে বললো, জিজ্ঞেস করলে মজর বললো- জনাব আমি ক্ষেতটি এক দিক খাওয়া আর এক দিক অক্ষত দেখেছি। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে উটটির এক চোখ নষ্ট। রবিয়া বললো- আমি ক্ষেতে এক পায়ের চিহ্ন বেশ ভারী আর অপর পা গুলোর চিহ্ন খুব হালকা দেখেছি, এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে উটটির একটি পা দুর্বল। আয়াদ বললো- আমি উটের বিষ্ঠাগুলো খুব কম দূরত্বে পড়ে থাকতে দেখেছি। এতে আমি অনুমান করেছি যে উটটি খুবই ধীর গতি সম্পন্ন। যদি দ্রুতগামী হতো, তা হলে বিষ্টাগুলো অনেক দূরত্বে পতিত হতো। আনমার বললো- আমি দেখেছি যে উটটি ক্ষেতের নরম অংশটি খেয়েছে, শক্ত অংশটি খায়নি। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে উটটির দাঁত দুর্বল। বাদশাহ ওদের বক্তব্য শুনে উটের মালিককে বললো- এরা তোমার উট দেখেনি, তুমি অন্যত্র তালাশ কর। অতঃপর বাদশাহ ওদের চারজনকে পানাহার ও বিশ্রাম করার জন্য মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিলেন। পানাহারের পর মজর বললো- আমরা যে শরাব পান করলাম, সেটা কোন কবরস্থানের বৃক্ষরাজির নির্যাস থেকে তৈরী। রবিয়া বললো, আমরা যে মাংসটা খেলাম, সেটা কুকুরের দুধ পান করা কোন ছাগলের। আয়াদ বললো, আমরা যে রুটি গুলো খেলাম, সেটার আটা কোন হায়েজওয়ালী মহিলার মথিত। আনমার বললো, আমরা আজ যার

মেহমান, সে ওর বাপের বৈধ সন্তান নয়। ওদের এ সব আলোচনা গুপ্তচর কর্তৃক বাদশাহের কানে পৌঁছলে, বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে শরাব প্রস্তুতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- মেহমানদেরকে পরিবেশিত শরাব কোথাকার ফলমূলের তৈরী? শরাব প্রস্তুতকারী বাদশাহের ভয়ার্ত চেহারা দেখে সত্যি সত্যি বলে দিল- হুযূর আপনার আব্বাজানের কবরে রোপিত ফলদার বৃক্ষরাজির নির্যাস থেকে এ শরাব তৈরী করা হয়েছে। কসাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, সেও সত্যি সত্যি বলে এ মাংস ছিল কুকুরের দুধ পান করিয়ে পালিত একটি মোটাতাজা ছাগলের। আটা মথনকারী গৃহপরিচালিকার খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে সত্যিই সে হায়েজের অবস্থায় ছিল। এ তিনটি বক্তব্য সঠিক হওয়ায় বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেল এবং মনে মনে ধারনা হলো চতুর্থ বক্তব্যও নিশ্চয় সঠিক হতে পারে। বাদশাহ রাগে অস্থির হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে সোজা মায়ের কামরায় গিয়ে ওর বুকের উপর বসে জিজ্ঞেস করলেন- সত্যি সত্যি বল, আমি বৈধ সন্তান, নাকি জারজ সন্তান? মা বললো, তুমি নিজেই অনুমান কর, তুমি যদি বৈধ সন্তান হতে, এ ভাবে আমার বুকের উপর বসতে? মৃত বাদশাহের ঔরসে আমার কোন সন্তান ছিল না। রাজত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি তোমাকে অবৈধ ভাবে লাভ করেছি এবং সবার কাছে বাদশাহের সন্তান হিসেবে ঘোষনা করেছি। এ বাস্তব কাহিনী শুনে বাদশাহ সীমাহীন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দরবারে ফিরে আসলেন এবং ঐ চারি ভাইকে ডেকে বললেন, তোমাদের সব কথা আমার কানে এসেছে এবং যাচাই করে সঠিক পেয়েছি। তবে আমি জানতে চাই, তোমরা এ সব কথা কি ভাবে বলতে পারলে? মজর বললো, জনাব, শরাব পান করলে মনে ফুর্তি ও শরীরে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু আপনার শরাব পান করে মন বিষন্ন ও শরীরে অলসতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমি বুঝতে পারলাম এটা কোন বাগানের নয় বরং কবর স্থানের বৃক্ষরাজির নির্যাস থেকে তৈরী শরাব। রবিয়া বললো- ছাগলের মাংসের চর্বি উপরের দিকে থাকে আর কুকুরের মাংসে চর্বি অংশ থাকে নিচের দিকে। আমাদেরকে যে মাংস পরিবেশিত হয়েছে, সেটায় চর্বি ছিল নিচের দিকে। কিন্তু আপনার দরবারে কুকুরের মাংস পাকতো অসম্ভব। তাই আমি অনুমান করলাম যে ছাগলটি হয়তো কোন কুকুরের দুধ পান করেছে। আয়াদ বললো, হায়েজওয়ালী মহিলার মথিত রুটি তরকারীর সাথে মিশালে বিকৃত হয়ে যায় এবং রুটি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আমরা যে রুটি গুলো খেয়েছি, সে গুলোর অবস্থা এ রকমই ছিল। তাই আমি অনুমান করেছি যে এ রুটির আটা কোন

তোমাকে খলিফা মনোনিত করেছি।) আমি বুঝে গেলাম ওর ছেলেদের নাম মূসা, ইব্রাহীম ও দাউদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার ছেলেরা এখন কোথায় আছে? আমাকে বলুন যেন আমি খুঁজে বের করতে পারি। সে তেলাওয়াত করলো وعلامات النجم هم يهتدون (অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের দ্বারা তারা পথের দিশা পায়) আমি বুঝে গেলাম, তারা কাফেলার মুয়াল্লিম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কিছু খাবেন? সে বললো- انى نذرت للرحمن صوما (অর্থাৎ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা মানত করেছি) আমি বুঝে গেলাম সে রোযাদার। আমি এ দিক সে দিক তালাশ করার পর যখন ওর ছেলেদের সাক্ষাত পেলাম, তখন তারা তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল এবং বললো আজ থেকে তিন দিন যাবত তিনি পথ হারিয়ে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। একটু পর সে তার ছেলেদেরকে বললো- فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজনকে এ মুদ্রা নিয়ে শহরে প্রেরন কর।) আমি বুঝে গেলাম, সে বাজার থেকে আমার জন্য কিছু আনার জন্য ছেলেদেরকে নির্দেশ দিল। এর কিছুক্ষন পর সেই নেককার মহিলার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল এবং প্রায় শেষ সময় এসে গেল। আমি ওর কাছে গিয়ে ওর অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলে সে তেলাওয়াত করলো- وجاء سكرت الموت بالحق (অর্থাৎ মৃত্যুর সকরাত এসেছে) এর পর সে মারা গেল। আমি সেই দিবাগত রাত্রে ওকে স্বপ্ন দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কোন্ অবস্থায় আছেন? সে বললো- ان المتقين فى جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر (অর্থাৎ নিশ্চয়ই পরহিজগারগণ বাগান ও নদীর তীরে মহা কুদরতের অধিকারীর সান্নিধ্যে। (নুজহাজুল মাজালিস- ২৭ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ নারী পুরুষ প্রত্যেকের কুরআন শিক্ষা আবশ্যক। আগের যুগের

মহিলারাও কুরআন সম্পর্কে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। তারা কথায় কথায় কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি করতে পারতো। আজ কাল মহিলারা তো দূরের কথা, পুরুষেরা কুরআন চর্চা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

কাহিনী নং- ৬৩০

সুন্দরী বাঁদী

এক যুবক স্নানাগার থেকে এক অতি সুন্দরী বাঁদীকে বের হতে দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়। সে ওর সামনে গিয়ে তিলাওয়াত করলো زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ অর্থাৎ আমি ওকে দর্শকদের জন্য রূপ দান করেছি। বাঁদী এর জবাবে এ আয়াত পড়লো وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মরদুদ শয়তান থেকে ওকে হেফাজত করেছি। যুবকটি পুনরায় পাঠ করলো- نُرِيْدُ اَنْ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا অর্থাৎ আমি শুধু এটাই চাচ্ছি যে সেখান থেকে খাই এবং মনকে শান্তি দি। বাঁদী এর উত্তরে বললো- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ কক্ষনো কল্যানে পৌছতে পারবে না, যতক্ষণ না প্রিয় বস্তু খরচ কর। যুবক বললো- وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا অর্থাৎ যে ঐ বস্তু না পায়, যদ্বারা বিবাহ হতে পারে। (তখন সে ব্যক্তি কি করবে?) বাঁদী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল- اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ সে এর থেকে দূরে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যুবকটি বিফল ও বিরক্ত হয়ে বললো- لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক। সেই বাঁদীও সাথে সাথে জবাব দিল- وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ এক পুরুষের জন্য দু মহিলার বরাবর (লানত)। যুবকটি আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। নাযেহাল হয়ে চলে গেল। (লুলুশ শরহে- ৩৪ পৃঃ)

সবক ঃ প্রতিটি প্রশ্নের জবাব কুরআনের আয়াত দ্বারা দেয়া যায়, যদি আহরন করার ক্ষমতা থাকে। আগের যুগের বাঁদীরাও কুরআনে পারদর্শী ছিল বিধায় সহজে কেউ তাদেরকে ঠকাতে পারতো না।

কাহিনী নং- ৬৩১
তিন বাঁদী

একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদের এক জন বাঁদীর প্রয়োজন হওয়ায় তিনি দরবারে ঘোষনা দেন। এ খবর পেয়ে তিন বাঁদী বাদশাহের দরবারে হাজির হলো এবং লাইন ধরে বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়ালো। বাদশাহ ওদেরকে দেখে বললেন- আমারতো প্রয়োজন এক জনের। কিন্তু তোমরা তিনজন এসে গেছ। ঠিক আছে আমি তোমাদের থেকে একজনকে বাচাই করে নিব। বাদশাহ যখন বাচাই করতে উঠলেন, তখন লাইনে যে সামনে ছিল, সে তেলাওয়াত করলো- وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে যারা প্রথম গমনকারী।

মাঝখানে যে ছিল, সে পাঠ করলো- وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ এ ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করেছি যেন তোমরা আগে পরের লোকদের সাক্ষ্যদানকারী হও।

সবের পিছনে যে ছিল, সে এ আয়াত তেলাওয়াত করলো- وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ তোমার জন্য শেষটা প্রথম থেকে উত্তম।

বাদশাহ তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং তিন জনকেই ক্রয় করে নিলেন। (লুলুশ শরাহ- ৪৯ পৃঃ)

সবক ঃ গান বাজনা নয়, কুরআন চর্চাই কামিয়াবীর চাবিকাটি।

কাহিনী নং- ৬৩২
দুই বাঁদী

আর একবার হারুনুর রশীদের এক বাঁদীর প্রয়োজন হওয়ায়, দুই বাঁদী এসে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে একজনের গায়ের রং ছিল কালো আর একজনের রং ছিল সাদা। বাদশাহ বললেন, আমারতো প্রয়োজন একজন। ঠিক আছে, আমি

তোমাদের মধ্যে ওকেই গ্রহণ করবো যে নিজের রং এর প্রাধান্য প্রমান করতে পারবে। সাদা রং ওয়ালী বললো সাদা রং সবার কাম্য। এ ছাড়া আরও কিছু স্বীয় রং এর সৌন্দর্য বর্ণনা করলো। কালো রং ওয়ালী বললো- হুযূর, দেখুন, ওর সাদা রং এর সামান্য অংশ যদি আমার চেহারার উপর দেয়া হয়, তাহলে সবাই আমাকে শ্বেতীরোগী বলবে আর আমার কালো রং এর সামান্য অংশ যদি ওর চেহারায় দেয়া হয়, তাহলে ওর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, আমার কালো রং তিলের মত হয়ে ওর চেহারায় চমকাবে। বাদশাহ হারুনুর রশীদ ওর উপস্থিত জ্ঞান দেখে খুশী হলো এবং ওকেই গ্রহণ করলো। (লুলুশ শরাহ- ৫০ পৃঃ)

সবক ঃ রূপসী থেকে জ্ঞানীর কদর অনেক বেশী।

কাহিনী নং- ৬৩৩
ছয় মেধাবী বাঁদী

খাজা মাহমুদ যরদার সিরাজী ছিলেন একজন বিলাসী শহুরে ধনাঢ্য ব্যক্তি। এক ঈদের দিন তিনি নদীর ধারে তাবু টাঙিয়ে আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করেন। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর ছয় জন বাঁদীও উপস্থিত ছিল, যারা মেধা ও বিচক্ষণতার কারণে যরদার সিরাজীর খুবই প্রিয় ছিল। আনন্দ অনুষ্ঠানের শেষে যরদার সিরাজী ওদের সাথে খোশ আলাপ করছিলেন। হঠাৎ ওদের মধ্যে একটি খেয়াল আসলো। তারা তাদের মুনিবকে বললো- আজ ঈদের দিনে, আনন্দঘন এ মূহুর্তে আপনি রায় দিন আমাদের মধ্যে সবচে উত্তম কে? যরদার সিরাজী বললেন, আমি রায় তখন দিতে পারবো, যখন তোমরা নিজেরাই একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করতে পার। তবে শর্ত হলো যে তোমাদের কথা গুলো যুক্তিপূর্ণ ও দলীল ভিত্তিক হতে হবে। এটা শুনে ফর্সা কালোকে, পাতলা মোটাকে এবং পাণ্ডবর্ণ গোধুম বর্ণকে প্রতিদ্বন্দী করে বিতর্ক শুরু করলো।

সর্ব প্রথমে ফর্সা রং এর বাঁদীটি কালো রং এর বাঁদীকে লক্ষ্য করে বললো- ওহে কালোনী, আমার শান কত উর্ধে জান, আমার রং সব রং থেকে শ্রেষ্ঠ। আমার কপাল উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল দীপ্তিমান, যেন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ। আল্লাহ তাআলা তার নবী মূসা আলাইহিস সালামকে এদে বয়জা' (ফর্সা হাত) দান করেন। আয়াতে রহমতে اِبْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ। (আমি ওদের চেহারাসমূহকে ফর্সা

করেছি) বলে ফর্সা রং এর প্রসংশা করা হয়েছে। হাদীছ শরীফে ফর্সা রং সব রং থেকে উত্তম রং বলে বর্ণিত আছে। বেহেশতের হুরদের রং ও ফর্সা। খাজা যরদার কালো রং এর বাঁদীকে অস্থির দেখে ফর্সা রং এর বাদীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওকে বলতে দাও। কালো বাঁদী মুখ খুললো এবং বলতে শুরু করলো- ওহে সাদা চামড়া নিয়ে গর্বকারিনী, তোমার জ্ঞান বলতে কিছুই নেই। তুমি কি কুরআনে পড়নি- وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى (রাতের কসম, যখন অন্ধকারে ডুবে যায় এবং দিনের কসম, যখন আলোকিত হয়) যদি কালো রাত্রি মর্যাদাবান না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা সেটার নামে কসম করতেন না এবং একে দিনের উপর অগ্রাধিকার দিতেন না। মনে হয় তোমার জানা নাই যে কালো হচ্ছে যৌবনের সৌন্দর্য। চুল যখন সাদা হয়ে আসে তখন বার্ধক্য মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। দেখ, যদি আমার কালো রং এর একটি অংশ তোমার চেহারায় পতিত হয়, তাহলে এতে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তোমার সাদা চামড়ার একটি অংশ যদি আমার চেহারায় স্থান পায়, তাহলে সবাই আমাকে শ্বেতীরোগী বলবে। সমস্ত কিতাব কালো কালি দ্বারাই লিখা হয়। মেশক-আম্বরের রংও কালো। যদি কালো রং সবচে উৎকৃষ্ট না হতো, তাহলে সৃষ্টিকর্তা চোখের মনির রং কালো করতেন না। খাজা যরদার বললেন, থাম যথেষ্ট হয়েছে।

এবার মুটকি বাঁদী বাহু উচিয়ে হেংলা পাতলা বাঁদীকে লক্ষ্য করে বললো, ওহে শীর্ণ কায়াধারিনী, আমার সাথে তোমার কি তুলনা হতে পারে? দুনিয়াতে কেউ হেংলা-পাতলাকে পছন্দ করে না। সবাই মোটা সোটা কামনা করে। এমনকি হেংলা-পাতলা কোন পশুকেও কেউ পছন্দ করে না। হেংলা-পাতলা আল্লাহ তাআলারও পছন্দ নয়। এ জন্য দুর্বল পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। তোমার ছিপছিপে দেহের প্রতি কেউ মোটেই আকৃষ্ট নয়।

হেংলা বাঁদী বললো- ওহে মুটকী, তোমার কলঙ্ককে গুন বলে প্রচার করছ কেন? মোটাকে জবেহ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেউ কামনা করে না। খোদার শুকরীয়া, তিনি আমাকে ফুলের ডালির মত পাতলা এবং মৃদুবাতাসের মত হালকা করে সৃষ্টি করেছেন। তুমিতো বালুর টিলা আর মাংসের পাহাড়। কোন প্রেমিকের মুখে কখনো কোন মুট্‌কীর প্রসংশা শুনেছ কি?

খাজা যরদার ওকে থামিয়ে হলদে বর্ণের বাঁদীকে বক্তব্য রাখার জন্য ইশারা করলেন। সে গোধুম বর্ণের বাঁদীর দিকে তাকিয়ে বললো- আমার রং হলো হলদে, আমি হলাম সুন্দরীদের মধ্যে অদ্বিতীয়, তারকারাজির মধ্যে দীপ্তিমান মোহর সদৃশ, উদ্ভিদের মধ্যে জাফরান সদৃশ, সরিষা ক্ষেতের ফুটন্ত ফুলের মত। ওহে গোধমী, তুলি হলে খোদার অদ্ভুত সৃষ্টি। তুমি, না সাদা, না কালো। তোমার রং দুঃখ দুদর্শার প্রতীক। কোন এক কবি তোমার সম্পর্কে খুবই সুন্দর বলেছেন-

برکرا غفل بود پیش رود راه نموں

شود شیفته ہر گز برخ گندم گوں

چونکه ادم دل را میل گندم کرد

کرد از جنت فردوس بروں

অর্থাৎ গৌধম বর্ণ মানুষকে বিপথগামী করে থাকে। গৌধম বর্ণের গুনধুমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে হযরত আদমকে জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে মর্তে পদার্পন করতে হয়েছে।

হলদে বর্ণের বাঁদীর কথা শেষ হলে গোধম বর্ণের বাঁদী ওকে লক্ষ্য করে বললো- আমি খোদার শুকরীয়া আদায় করছি যে তিনি আমাকে অপূর্ব আকৃতি দান করেছেন। আমি মোটাও নই, হেংলাও নই, আবার সাদাও নই, কালোও নই এবং টিকটিকির মত হলদেও নই। আমি হলাম গোধুম বর্ণের, যেটাকে সবচে উৎকৃষ্ট রং মনে করা হয়। আমি হলাম ফর্সা ও কোমলতার সমন্বয়। কবিগণ আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং প্রেমিকগণ আমার রূপে সমোহিত।

খাজা যরদার ওদের এ হৃদয়গ্রাহী বিতর্ক শুনে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কারো থেকে কম নয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এটাই আমার রায়।

(সংগ্রহ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেটা যথার্থ করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে মানানসই।

কাহিনী নং- ৬৩৪

মহিলার ধোকা

মিশরের আমর বিন আস জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন আবুল হাসন আল হুসাইনীর কাছে এক দল ব্যবসায়ী বর্ণনা করেন- আমরা বিভিন্ন শহর থেকে মিশরের আমর বিন আস জামে মসজিদে এসে একত্রিত হই। এক দিন আমরা কয়েকজন বসে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম আমাদের নিকটস্থ একটি থামের পাশে জনৈকা মহিলা মুখ কালো করে বসে রয়েছে। আমাদের মধ্যে বাগদাদের এক ব্যবসায়ী ছিল। সে ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? তুমি এখানে কি করছ? সে বললো- আমি একজন অসহায় মহিলা। দশ বছর যাবত আমার স্বামীর কোন খোঁজ খবর নেই। আমি কাজীর কাছে এসে ছিলাম অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতির জন্য। কিন্তু আমাকে অনুমতি দিলেন না। আমার স্বামী এমন কোন সহায় সম্বলও রেখে যায় নি যেটা দ্বারা আমি জীবন ধারন করতে পারি। তাই আমি এমন একজন অপরিচিত ব্যক্তি তালাশ করছি যে আমার উপকারার্থে কাজীর দরবারে গিয়ে বলবে যে আমার স্বামী মারা গেছে অথবা আমাকে তালাক দিয়েছে যেন আমি অন্যত্র বিবাহ করতে পারি।অথবা এ রকম বলে, আমি ওর স্বামী, ওকে তালাক দিয়ে দিলাম। এতেও আমি ইদ্দত পূর্ণ করার পর বিবাহ করার সুযোগ পাব। ব্যবসায়ী লোকটি বললো, ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে কাজীর দরবারে গিয়ে বলবো- আমি তোমার স্বামী এবং তোমাকে তালাক দিলাম। তবে আমাকে এক দিনার দিতে হবে। এ কথা শুনে মহিলাটি কাঁদতে লাগলো এবং একটি সিকি (এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ) বের করে বললো, খোদার কসম, এটা ছাড়া আমার কাছে আর একটি পয়সাও নেই। ব্যবসায়ী লোকটি ওর থেকে সেই সিকিটা নিল এবং ওর সাথে কাজীর দরবারে গেল। এরপর আমরা সারা দিন ওর দেখা পেলাম না। পর দিন দেখা হলে জিজ্ঞেস করলাম- গত কাল সারাদিন কোথায় ছিলে? সে বললো, ভাই সে কথা আর বল না, আমি এমন এক ফাঁদে পড়েছিলাম যেটা মুখে আনতেও অপমান বোধ করছি। আমরা পীড়াপিড়ি করলে, সে বললো- আমি যখন মহিলাটির সাথে কাজীর

সেখানে গেলাম, সে কাজীর সামনে আমার স্ত্রী দাবী করে এবং আমি দশ বছর নিরুদ্দেশ থাকার কথা বলে আমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আর্জি পেশ করে। আমি ওর অভিযোগ স্বীকার করে ওকে তালাক দিতে সম্মত হলাম। কাজী সাহেব ওকে এতে সন্তুষ্ট কিনা জিজ্ঞেস করলে সে বললো- হুজুর ওর জিম্মায় আমার মোহরানা ও দশ বছরের ভরন পোষন বাকী আছে। কাজী সাহেব আমাকে ওর প্রাপ্য আদায় করতে বললে আমি থ হয়ে যাই এবং আসল ঘটনা বলারও সাহস হারিয়ে ফেললাম। আমার গড়িমসি দেখে কাজী সাহেব আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে বিশ দিনার দিয়ে রেহাই পেলাম। ওর থেকে যে সিকি দিনার নিয়ে ছিলাম, সেটার সাথে আমার থেকে আরও কিছু যোগ করে উকীল পেশকারকে দিতে হয়েছে। আমরা এটা নিয়ে খুবই হাসাহাসি করেছি। সে খুবই লজ্জিত হয়ে মিশর ছেড়ে চলে গেল। এর পর আর কোন দিন ওর দেখা পাইনি। (কিতাবুল আজকিয়া- ৪৫৬ পৃঃ)

সবক ঃ মহিলারা অতি সহজে পুরুষদেরকে ধোকা দিতে পারে। তাই অপরিচিত মহিলাদের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৬৩৫

অভিজাত ধোকা

এক সুন্দরী মহিলা বড় লোকের বেশ ভুষায় লন্ডনের এক প্রসিদ্ধ স্বর্ণ দোকানে প্রবেশ করে বললো- আমি অমুক ডাক্তারের স্ত্রী, আমাকে কিছু মূল্যবান গহনা দেখান। দোকানের মালিক বেশ কিছু মূল্যবান গহনা ওকে দেখালো। সে কয়েকটি পছন্দ করে বললো- এ গুলো একটি বক্সে ভরে আপনার একজন লোক আমার সাথে দিন, বাইরে কার দাঁড়ানো আছে। গহনা গুলো ডাক্তার সাহেবকে একটু দেখাতে চাই। ওখানে আপনার লোককে এর মূল্য দিয়ে দেয়া হবে। দোকানের মালিক সরল বিশ্বাসে লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার একটি বক্সে ভরে ওকে দিয়ে দিল এবং এক কর্মচারীকে ওর সাথে পাঠালো।

মহিলা কারটি নিজেই চালিয়ে শহরের এদিক সেদিক ঘুরে এক প্রান্তে এসে এক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে কার দাঁড় করায়ে সেই কর্মচারীকে বললো-

তুমি কারে অপেক্ষা কর। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। একটু পরে তোমাকে ডেকে নিব। মহিলা ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার সাহেবকে বললো- ডাক্তার সাহেব! আমার স্বামী মানসিক রোগী। সে অনেক বড় স্বর্ণকার ছিল। ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে সব সময় শুধু বলে- দাও, স্বর্ণের দাম দাও, আমার স্বর্ণালঙ্কার, আমি স্বণের টাকার জন্য এসেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে দেখলে ওর পাগলামী আরও বৃদ্ধি পায়। তাই আমি পাশের কামরায় গিয়ে বসছি। সে কারে বসা আছে। আপনি ওকে ডেকে আনিয়ে একটু দেখুন। আপনার ফী টাও নিয়ে নিন। ডাক্তারের ফী দিয়ে মহিলা পাশের কামরায় চলে গেল। ডাক্তার তাঁর দু সহকারীকে পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে আনলেন। লোকটি চেম্বারে প্রবেশ করার সাথে সাথে বললো- ডাক্তার সাহেব, গহনা পছন্দ হয়েছে? খুবই উন্নত স্বর্ণ। ডাক্তার সাহেব মুচকি হেসে বললেন, হ্যা, পছন্দ হয়েছে, বসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। অতঃপর ডাক্তার সাহেব ওর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা শুরু করলেন। স্বর্ণ দোকানের কর্মচারী তা দেখে গাবড়িয়ে বললো- ব্যাপার কি? আমি আসলাম টাকার জন্য আর আপনি করছেন কি? ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কিসের টাকা? সে সমস্ত কথা খুলে বললে, ডাক্তার সাহেব পাশের কামরা থেকে মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। পাশের কামরায় গিয়ে দেখে মহিলা নেই। বাহির হয়ে দেখে গাড়ীটাও উধাও হয়ে গেছে। (মাহে তৈয়্যবা- ৯৫৫ পৃঃ)

সবক ঃ এ আধুনিক যুগে নানা আধুনিক ধোকাও হয়ে থাকে। তাই যে কোন কাজ সুবিবেচনার সাথে করা উচিত।

কাহিনী নং- ৬৩৬

স্ত্রীর মুরিদ

এক জেলে এক বাদশাহের দরবারে গিয়ে কিছু মাছ বাদশাহকে হাদিয়া দিল। বাদশাহ এতে খুশী হয়ে ওকে চারশ টাকা বখশীশ দিলেন। বাদশাহের হিংসা পারায়ন স্ত্রীর কাছে তা মোটেই পছন্দ হলো না। সে বাদশাহকে বললো অল্প মাছের জন্য এত টাকা দিয়ে দেয়াটা মোটেই উচিত হয় নি। আপনি টাকাগুলো ফেরত নিয়ে নেন। বাদশাহ বললেন, দিয়ে দেয়ার পর কি করে ফেরত নিই? স্ত্রী বললো

আমি পন্থা বাতলিয়ে দিচ্ছি- আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন মাছগুলো মেয়েলী, নাকি মদ্দা? সে যদি মেয়েলী বলে আপনি বলবেন আমার মদ্দা প্রয়োজন আর মদ্দা বললে আপনি বলবেন, আমার মেয়েলী প্রয়োজন। এ বাহানায় টাকাগুলো ফেরত নিয়ে নেন। বাদশাহ স্ত্রীর শিখানো পন্থা মোতাবিক জেলেকে ডেকে সেই প্রশ্ন করলেন। জেলে বড় চালাক ছিল। সে বললো, হুযূর, আমার এ মাছ মেয়েলীও নয়, মদ্দাও নয়। এ গুলো হিজরা প্রকৃতির। বাদশাহ ওর বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ জবাব শুনে খুশী হয়ে আরও চারশ টাকা বখশীশ দিলেন। বাদশাহের স্ত্রী এতে আরও ক্ষেপে গেল। ইত্যবসরে জেলের হাত থেকে একটি টাকা পড়ে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা উঠিয়ে নেয়। এটা দেখে স্ত্রী সুযোগ পেয়ে গেল। সে বাদশাহকে বললো, দেখ লোকটি কি লোভী, আটশ টাকার মধ্যে থেকে মাত্র একটি টাকা পড়ে যাওয়ায় সে কী তড়িৎ গতিতে টাকাটা উঠিয়ে নিল। আপনি এটার জন্য অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে ওর থেকে সমস্ত টাকা ফেরত নিয়ে নেন। বাদশাহ ওকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আটশ টাকা থেকে মাত্র এক টাকা যখন পড়ে গেল, সেটা পড়ে থাকতে দিতে, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিলে কেন? জেলে বললো- হুযূর, সেটাতে আপনার নাম খুঁদানো ছিল। আপনার নামের বেআদবী হওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করিনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিয়েছি। বাদশাহ ওর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে ওকে আরও চারশ টাকা বখশীশ দিলেন এবং সারা শহরময় ঢোল পিটায়ে ঘোষনা করলেন, কেউ যেন স্বীয় স্ত্রীর অন্ধবিশ্বাসী না হয়। (নুজহাতুল মাজালিস- ১২ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ স্ত্রীর অন্ধবিশ্বাসী হওয়া মোটেই উচিত নয়। দুর্বল চেতা পুরুষেরাই এ ধরনের হয়ে থাকে। যে কোন কাজে নিজের চোখ কান খোলা রাখা উচিত।

কাহিনী নং- ৬৩৭

কাঠের মহিলা

এক দর্জি, এক কাঠ মিস্ত্রী, এক স্বর্ণকার ও এক ফকীর একত্রে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিল। পথে রাত হয়ে যাওয়ায় তারা পথের ধারে জংগলে অবস্থান করলো এবং সারা রাত পাহারার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিল যে প্রত্যেকে দুঘন্টা করে পাহারা দিবে। এক জন পাহারা দিলে বাকী তিন জন ঘুমাবে। প্রথমে কাঠমিস্ত্রীর

পালা পড়লো। সে পাহারার জন্য জাগ্রত রইলো, বাকী তিন জন ঘুমিয়ে পড়লো। সে মনে মনে চিন্তা করলো বেকার বসে থাকার চেয়ে কোন একটা কাজ করলে সময় কাটবে। ওর সাথে হাতিয়ার ছিল। সে দু'ঘন্টার মধ্যে একটি কাঠকে খুঁদাতে খুঁদাতে একটি মহিলার প্রতিকৃতি তৈরী করে ফেললো। কাঠ মিস্ত্রীর পর দর্জির পালা ছিল। সে ঘুম থেকে উঠে কাঠের তৈরী মহিলার প্রতিকৃতি দেখে বুঝতে পারলো যে এটা কাঠমিস্ত্রীর কাজ। সে চিন্তা করলো আমিও কেন বেকার বসে থাকবো, আমার কাছেতো সেলাই এর সরঞ্জামাদি মওজুদ আছে। আমি এর জন্য একটি সুন্দর কাপড় তৈরী করতে পারি। অতপর সে দু'ঘন্টার মধ্যে একটি কাপড় তৈরী করে সেই কাটের প্রতিকৃতিতে পরিয়ে দিল। স্বর্ণকার ঘুম থেকে উঠে কাঠ মিস্ত্রী ও দর্জির কৃতকর্ম দেখে সেও বসে থাকেনি। দু'ঘন্টার মধ্যে সে অপূর্ব সুন্দর অলংকার তৈরী করে সেই প্রতিকৃতিকে পরিয়ে দিল। সর্বশেষে ফকীর ঘুম থেকে উঠে এ দৃশ্য দেখে সাথে সাথে সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো- হে আল্লাহ! আমার কাছে তো কিছুই নেই। তুমি কাঠের এ প্রতিকৃতির মধ্যে প্রান সৃষ্টি করে আমার ইজ্জত রক্ষা কর। আল্লাহ ওর দুআ কবুল করলেন এবং কাটের সেই মহিলা প্রতিকৃতি জীবিত মহিলায় পরিনত হয়ে গেল।

সকালে এ মহিলাকে দেখে চারজনই টানাটানি শুরু করলো। প্রত্যেকে ওকে নিজের বলে দাবী করলো। এ নিয়ে ওদের মধ্যে ভীষন ঝগড়া হলো। শেষ পর্যন্ত নিকটস্থ শহরের এক বিচারকের কাছে বিচার দিল। বিচারক সেই মহিলাকে দেখে বললো তোমরা চারজন মিথ্যুক, এ মহিলা আমার। এবার মহিলা নিজেই মুখ খুললো এবং বললো- আমি কি বলবো আমি কার? বিচারক বললো, হ্যাঁ বল। তখন মহিলাটি দৌড়ে গিয়ে নিকটস্থ একটি গাছকে জড়িয়ে ধরলো এবং গাছের আকৃতি হয়ে গাছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে সবাই একে অপরের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ শিশু জন্ম হলে মা-বাপ বলে আমাদের সন্তান, চাচা বলে আমার ভাতিজা, মামা বলে আমার ভাগিনা, ভাই বলে আমার ভাই। কিছু দিন পর মাটির তৈরী এ শিশু মারা গেলে আবার মাটির সাথে মিশে যায়। তখন আমার দাবীকারীরা একে অপরের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ৬৩৮
হীরার সন্ধানে

মিস্টার শকি মিষ্টার শাতেরের সব পকেট খুজে দেখলো কিন্তু হীরার সন্ধান পেল না। সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ সে শোবার সময় দেখেছে যে মিষ্টার শাতের ওর সামনে হীরা পকেটে রেখেছে। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যে সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিস্টার শাতের শহরের একটি প্রসিদ্ধ মনিমুক্তার দোকান থেকে অতি মূল্যবান হীরাটা চুরি করে নাগালের বাইরে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর বগিতে উঠেছিল। মিষ্টার শকিও ওকে অনুসরন করে একই বগিতে পাশাপাশি সিট নিল। দুজনের কামরা হওয়ায় মিঃ শকি খুব খুশী হলো। সন্ধ্যার সময় ট্রেন ছাড়লো। মিঃ শকি মিঃ শাতেরকে জিজ্ঞেস করলো- আপনি কোথায় যাবেন?

মিঃ শাতের বললো- আমি লন্ডনে যাব। মিঃ শকি বললো- খুবই ভাল হলো, দু'দিন দু'রাত এক সাথে থাকা যাবে। আমিও লন্ডনে যাব। রাত দশটার সময় শোবার আগে মিঃ শাতের পকেট থেকে হীরাটা বের করে মিঃ শকির সামনে নেড়ে ছেড়ে পুনরায় পকেটে রেখে দিল। অতঃপর উভয়ে নিজ নিজ সিটে ঘুমিয়ে পড়লো।

অর্ধরাতে মিঃ শকি হীরাটা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে চুপে চুপে উঠে মিঃ শাতেরের পকেট তালাশী করলো কিন্তু হীরাটা খুঁজে পেল না। নিরাশ হয়ে পুনরায় শুয়ে পড়লো। সকালে মিঃ শাতের মিঃ শকির সামনে পকেট থেকে হীরাটা বের করলে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মনে মনে স্থির করলো যে আজ রাত্রে হীরাটা যে কোন উপায়ে নিয়ে নিবে। রাত্রে শোয়ার সময় মিঃ শাতের হীরাটা পকেটে আছে কিনা বের করে দেখে পুনরায় মিঃ শকির সামনে পকেটে রেখে দিল এবং উভয়ে শুইয়ে পড়লো। মধ্য রাতে মিঃ শকি চুপে চুপে উঠে মিঃ শাতেরের পকেট খুবই ভাল মতে খুঁজে দেখলো কিন্তু হীরার কোন হদিস পেল না। ব্যাপারটা ওর কাছে খুবই রহস্যময় মনে হলো। কারণ ওর সামনেই হীরা পকেটে রাখা হয়েছে কিন্তু এখন গেল কই। যাক শেষে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লো। সকালে ঘুম থেকে উঠে মিঃ শাতেরের হাতে হীরা দেখে সে খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো- জনাব আপনার এ হীরা মধ্যরাতে কোথায় চলে যায়? মিঃ শাতের বললো, জনাব, আমি তোমার থেকে কম চালাক নই। তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি, তুমি

কোন্ ধরনের লোক এবং কেনইবা আমার পাশে সিট নিয়েছ। আমি এ হীরাটি তোমার থেকে রক্ষা করার জন্য কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়েছি। আমি চিন্তা করলাম যে তুমি দিনের বেলায় কিছু করতে পারবে না। তবে রাত্রে হীরাটা চুরি করার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালাবে। তাই তোমাকে বিভ্রান্তি করার জন্য রাত্রে তোমার সামনে হীরাটা পকেট থেকে বের করে পুনরায় পকেটে রেখে শুয়ে পড়তাম। তোমার ঘুম আসলে আমি হীরাটা আমার পকেট থেকে বের করে তোমার পকেটে রেখে দিতাম। যার ফলে তুমি মধ্য রাত্রে উঠে হন্য হয়ে আমার পকেট তালাশ করে বিফল হতে। (হেকায়তে মছনবী অবলম্বনে)

সবক ঃ খোদার সন্ধানে অনেকে পাহাড় জংগল চষে বেড়ায়। অথচ খোদা নিজেদের মধ্যে মওজুদ।

কাহিনী নং- ৬৩৯

পরিপূর্ণ জবাব

এক দার্শনিক এক আধ্যাত্মিক সাধককে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো- (১) জনাব, খোদা তো দেখা যায় না। তবুও আপনারা اشـهـد। (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক) বলে সাক্ষ্য দেন কেন? (২) প্রত্যেক কাজ যখন আল্লাহ করেন, বান্দা অপরাধী হয় কেন? (৩) আগুনের তৈরী শয়তানকে দোযখে দিলে ওর কিবা শাস্তি হবে? কারণ আগুন আগুনকে কি ভাবে কষ্ট দিতে পারে? সাধক এ তিন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটি মাটির ঢিল নিয়ে দার্শনিকের মাথায় ছুড়ে মারলো। এতে দার্শনিকের মাথা ফেটে গেল। দার্শনিক ওনার সাথে কোন তর্ক বিতর্ক না করে সোজা কোর্টে গিয়ে মোকদ্দমা দায়ের করলো। সাধককে কোর্টে তলব করা হলো এবং বিচারক ওনার কাছে ঢিল মারার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সাধক বললেন, আমিতো অনর্থক ঢিল মারিনি। এর দ্বারা ওনার তিনটি প্রশ্নের একটি পরিপূর্ণ জবাব দিয়েছি। বিচারক বললেন, এটা কোন ধরনের জবাব? সাধক বললেন, দার্শনিককে জিজ্ঞেস করুন, ঢিল লাগার ফলে সে কষ্ট পেয়েছে কি না? দার্শনিক বললো, নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছি। কষ্ট পেয়েছি বলেই তো অভিযোগ করেছি। সাধক পুনরায় জানতে চাইলেন- কষ্টটা দেখেছে কিনা? দার্শনিক বললো কষ্টতো দেখা যায় না, অনুভব হয়। সাধক বললেন- এটা ওনার প্রথম প্রশ্নের জবাব। আল্লাকে দেখা যায় না কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- ওনার কথা হলো প্রত্যেক কাজ আল্লাহ করেন, আমাদেরকে কেন অভিযুক্ত করা হবে? ঢিলও আল্লাহ মেরেছেন,

আল্লাহকে জিজ্ঞেস করুক। আমাকে কেন অভিযুক্ত করা হলো? তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হলো- দার্শনিক মাটির তৈরী এবং ঢিলও মাটির ছিল। মাটি যেমন মাটিকে কষ্ট দিতে পারে, তেমন আগুন ও আগুনকে কষ্ট দিতে পারে। এ উত্তর শুনে দার্শনিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলো এবং দায়েরকৃত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল। (মাহে তৈয়্যবা- জানুয়ারী)

সবক ঃ দর্শন অনেক সময় মানুষকে বিপদগামী করে থাকে। আল্লাহ ওয়ালা গণের তাৎপর্যপূর্ণ কথাবার্তায় মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়।

কাহিনী নং- ৬৪০

হাতের তালুর লোম

এক বাদশাহ এক দিন ভরপুর দরবারে ঘোষনা করলেন- আমার হাতের তালুতে লোম কেন নেই, যে বলতে পারবে, আমি ওকে যা চায় তা দেব। তবে যুক্তিপূণ উত্তর দিতে না পারলে কতল করবো।

বাদশাহের এ ঘোষনা শুনে কেউ জবাব দেয়ার সাহস পেল না। কিছুক্ষন পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো- হুযূর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব। বাদশাহ বললেন, ভালমতে চিন্তা করে দেখ, যুক্তি পূর্ণ জবাব না হলে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সে বললো- আমি সব কিছু ভেবে চিন্তেই বলছি। বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে বল, আমার তালুতে লোম নেই কেন?

সে বললো- হুযূর, আপনি হলেন বড় দানবীর। সদা দান করতে থাকেন। দান করতে করতে আপনার হাতের লোম ক্ষয়ে গেছে। বাদশাহ এ উত্তর শুনে খুশী হলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তোমার হাতের তালুতে লোম নেই কেন? সে বললো- হুযূর আপনি যা কিছু দান করেন, প্রধানতঃ আমাকেই করে থাকেন। তাই আপনার তালুর লোম দিতে দিতে আর আমার লোম নিতে নিতে ক্ষয়ে গেছে। বাদশাহ দরবারের উপস্থিত অন্যদের প্রতি ইশারা করে বললেন- ওদের হাতের তালুতে লোম নেই কেন? সে বললো- হুযূর আপনার দিতে দিতে, আমার নিতে নিতে আর ওদের না পাওয়ার হতাশায় হাত কচলাতে কচলাতে লোম ক্ষয়ে গেছে। বাদশাহ ওর জবাব শুনে ওকে অনেক পুরস্কার দিলেন। (মাহে তৈয়্যবা)

সবক ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা স্বীয় বুদ্ধিমত্বার বলে অনেক কিছু জয় করতে পারে।

কাহিনী নং- ৬৪১

সাদা সাপ

ইব্রাহীম নামের এক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন- আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর কয়েক জন বন্ধুর সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে আমরা সাদা রং এর একটি সুন্দর সাপ দেখতে পেলাম, সেটার শরীর থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধ বের হচ্ছিল। সাপটি খুবই অস্থির ছিল। মনে হচ্ছিল কোন কষ্টে আছে। একটু পরে সাপটি মারা গেল। ওর সুগন্ধময় শরীর দেখে আমার মনে ওর প্রতি মায়া সৃষ্টি হয়। আমি ওকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে রাস্তার অদূরে একটি ভাল জায়গায় দাফন করে পুনরায় পথ চলতে লাগলাম। মাগরিবের আগে আমরা এক নির্জন জায়গায় বিশ্রাম নিলাম। একটু পরে দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে চারজন মহিলা এসে উপস্থিত। ওদের মধ্যে এক জন বললো- তোমাদের মধ্যে ওমরকে কে দাফন করেছে? আমরা জিজ্ঞেস করলাম- ওমর কে? সে বললো, সেই সাদা সাপ, যেটাকে তোমাদের মধ্যে কোন একজন দাফন করেছো, সেই ছিল ওমর। আমি বললাম, ওকে আমি দাফন করেছি। তখন সে আমাকে লক্ষ্য করে বললো- তুমি এক তাহাজ্জুদ গুজার ও রোযা পালনকারী মুমিন জ্বিনকে দাফন করেছ। সে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গুনকীর্তন, তাঁর পৃথিবীতে আগমনের চারশ বছর আগে আসমানে শুনেছিল। সে তখন থেকেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান এনে ছিল।

আমি এ কথা শুনে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করলাম এবং মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌছে হজ্ব সমাপনের পর হযরত ওমর ফারুকের সাথে মুলাকাত করলাম। তখন তাঁর খেলাফত চলছিল। তিনি আমার মুখে সাদা সাপের কাহিনী শুনে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখেও সেই জ্বিনের আলোচনা শুনেছি। (হায়াতুল হায়ওয়ান ১৭৪ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ জ্বিনরা কয়েকশ বছর বেঁচে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং ঈমান এনেছে।

কাহিনী নং- ৬৪২

ওমর বিন জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত ছিফওয়ান বিন মুয়াত্তল বলেন- একবার আমরা কয়েক জন মিলে হজ্বের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম। পথে একটি বড় সাপ দেখলাম, সেটা রাস্তার উপর ছটপট করছিল এবং কিছুক্ষণ পর মারা গেল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে একজন পকেট থেকে এক টুকরা কাপড় বের করে সেই মৃত সাপকে সেটা দিয়ে জড়িয়ে রাস্তার এক কিনারে দাফন করলেন। আমরা যখন মক্কা মুয়াজ্জমা পৌছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম, তখন আমাদের সামনে এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো- আপনাদের মধ্যে সেই নেককার বন্দা কে, যিনি ওমর বিন জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে ভাল আচরন করেছেন? আমরা বললাম- আমরাতো ওমর বিন জাবের নামের কাউকে চিনি না। লোকটি বললো- সে কে, যিনি রাস্তায় সাপের কাফন-দাফন করেছেন? আমরা আমাদের সেই সঙ্গীকে দেখিয়ে দিলাম। লোকটি ওনাকে লক্ষ্য করে বললো- জাযাকাল্লাহ, আপনি যে সাপটির কাফন দাফন করেছেন, তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একজন বিশিষ্ট জ্বিন সাহাবী ছিলেন। ওনার নাম ওমর বিন জাবের। তিনি সেই নয় জ্বিনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন। (রুহুল বয়াল ৪৮৮ পৃঃ ৪ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মানব-জ্বিন উভয়ের রসূল। জ্বিনদের মধ্যে অনেকেই সাহাবী হওয়ার সুভাগ্য লাভ করেছেন।

কাহিনী নং- ৬৪৩

সুরক (রাদি আল্লাহু আনহু)

একদিন হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদি আল্লাহু আনহু) এক জনমানবহীন মাঠ দিয়ে যাবার সময় এক বিরাট মৃত সাপ দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর চাদর ছিঁড়ে এর এক অংশ দিয়ে সাপটি মুড়িয়ে মাটিতে দাফন করে দিলেন। দাফনের পর তিনি এ আওয়াজটি শুনতে পেলেন। "হে সুরক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

যে, আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পবিত্র মুখে শুনে ছিলাম, তিনি তোমাকে বলেছিলেন- হে সুরক, তুমি এক বিরান ভূমিতে মৃত্যুবরন করবে এবং এক নেককার পুরুষ তোমার কাফন-দাফন করবে।"

হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ এ আওয়াজ শুনে বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুক, তুমি কে? আর আমি এটা কার আওয়াজ শুনছি? জবাব আসলো- আমি ওসব জ্বিনদের অন্তর্ভূক্ত, যারা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরানী জবানে কুরআন পাক শুনেছিল। ওসব জ্বীনদের মধ্যে আমি আর সুরক ছাড়া কেউ জীবিত নেই। এখন সুরকও চলে গেল, একমাত্র আমিই জীবিত আছি। (হায়াতুল হায়ওয়ান- ১৭৪ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ জ্বিনদের মধ্যেও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও সাহাবীয়াতের মর্যাদা লাভ কারী রয়েছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ জায়গায় মারা যাবে, এটা আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জানা ছিল।

কাহিনী নং- ৬৪৪

ভয়াল মরুদ্যান

হযরত সাঈদ বিন জবির (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন- তমিমী গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- একবার সফরকালে আমাকে এক বিরাট ভয়াল মরুভূমিতে রাত যাপন করতে হয়েছিল। সেই সময় আমার উষ্ট্রী ছাড়া আমার সাথে আর কেউ ছিল না। উষ্ট্রীকে পাশে এক জায়গায় বেঁধে আমি শুয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে এ বাক্যটি পড়ে নিলাম- اعوذ بعظيم هذا الوادى (এ মুরুভূমির বড় জ্বীনের পানা চাচ্ছি) ঘুম আসার সাথে সাথে স্বপ্ন দেখলাম যে খড়গ হস্ত এক ভয়াল আকৃতির যুবক এসে আমার উষ্ট্রীর গলায় খড়গ রাখলো। এটা দেখে আমি ভয় পেয়ে জেগে গেলাম। এদিক সেদিক তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখলাম না। মনের ভয় ও কল্পনা মনে করে পুনরায় শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় বার সেই একই যুবককে খড়গ হস্তে দেখা গেল। সে খড়গটি পুনরায় আমার উষ্ট্রীর গলার উপর রাখলো। আমি পুনরায় জেগে উঠলাম এবং দেখলাম যে আমার উষ্ট্রীটি কাঁপতেছে। আমি আবার শুয়ে পড়লাম এবং

তৃতীয় বারও একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জেগে গেলাম। দেখলাম যে আমার উষ্ট্রীও ভয়ে তরতর করে কাঁপতেছে। আমি পিঁছনে ফিরে দেখি সেই যুবক খড়গ হস্তে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওর সাথে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখা গেল, যিনি সেই যুবক কে ধরে রেখেছিল এবং উষ্ট্রীর কাছে আসা থেকে বাঁধা দিচ্ছিল। এ নিয়ে উভয়ে পরস্পর ঝগড়া করছিল। একটু পরে বড় বড় তিনটি ষাড় কোত্থেকে ওখানে এসে হাজির হলো। বৃদ্ধ লোকটি সেই যুবকটিকে বললো, এ তিনটা থেকে যেটা ইচ্ছে, সেটা নিয়ে চলে যাও কিন্তু আমার প্রতিবেশীর উষ্ট্রীকে স্পর্শ কর না। যুবকটি একটি ষাড় নিয়ে ওখান থেকে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি আমাকে লক্ষ্য করে বললো, ভাই, এখন থেকে তোমরা এ ধরনের ভয়াল জায়গাসমূহে কোন জ্বীনের আশ্রয় প্রার্থনা করিও না। এখন আর ওদের সেই দাপট ও ক্ষমতা নেই। এখন থেকে তোমরা এ রকম বলিও اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادى। (আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ভয়াল মরুদ্যানে।) আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে? সে বললো- তিনি রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বললো- তিনি মদীনা মনোয়ারায় থাকেন। আমি এটা শুনে অতি উৎসাহে আমার উষ্ট্রীর উপর আরোহন করে সোজা মদীনা মনোয়ারায় চলে গেলাম এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বারগাহে উপস্থিত হলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখা মাত্র আমার সেই ঘটনা হুবহু বলে দিলেন এবং আমাকে মুসলমান হয়ে যাবার আহবান জানালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন- ১৮৪ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমনে বাতিলের জোর দাপট খর্ব হয়ে গেছে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রেসালত সার্বজনীন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানী।

কাহিনী নং- ৬৪৫

মুবাল্লিগ জ্বীন

হযরত খরীম বিন ফাতিক (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর ইসলাম গ্রহনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমার কয়েকটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। আমি ওগুলো তালাশ করতে বের হলাম। এদিক সেদিক তালাশ করতে করতে এক মরুদ্যানে গিয়ে উট গুলো খুজ পেলাম। অনেকক্ষন হাঁটা হাঁটির ফলে ভীষন ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে পড়লাম এবং শোবার সময় আমার অভ্যাস মুতাবিক এ বাক্যটি পড়লাম نعـــوذ بعـــزيـز هـذا الـوادى (আমি এ মরুদ্যানের প্রভাব শালী জ্বীনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) আমি এটা বলার সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে শুনতে পেলাম-

عذ يافتى بالله ذى الجلال – والمجد والنعماء والافضال

ووحد الله ولاتبال – قد مماد كيد الجن فى سفال

অর্থাৎ, হে যুবক, আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা কর, যিনি সর্ব শক্তিমান ও ক্ষমা ও দয়ার মালিক। তাঁর একত্ব স্বীকার কর। জ্বীনদের উৎপাত ও দাপট এখন আস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমি এ আওয়াজ শুনে বললাম- হে অদৃশ্য থেকে আহবান কারী! খোলাখুলি বল, তোমার উদ্দেশ্য কি? এবং আমার হেদায়েতের জন্য কি করনীয়? পুনরায় আওয়াজ আসলো-

جاء رسول الله ذو الخيرات – بيثرب يدعوا الى النجاة

অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল তশরীফ এনেছেন, যিনি মদীনা মনোয়ারায় আছেন এবং নাজাতের দিকে আহবান করছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো- আমি জ্বীন, আমার নাম আমর বিন আছাল এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে নজদের মুসলমান জ্বীনদের মুবাল্লিক নিয়োজিত হয়েছি। আমি বললাম, যদি কেউ আমার এ উট গুলো আমার ঘরে পৌছিয়ে দেয়, আমি

এক্ষুনি সোজা মদীনা মনোয়ারায় গিয়ে ঈমান গ্রহন করবো। আওয়াজ আসলো- তুমি মদীনা মনোয়ারায় চলে যাও এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে ঈমান গ্রহন কর। তোমার উটগুলো আমি তোমার ঘরে পৌছিয়ে দিব।

তখন আমি একটি উটে আরোহন করে মদীনা মনোয়ারায় চলে গেলাম। দিনটি ছিল জুমাবার। যে সময় আমি পৌছেছি, তখন নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি উট থেকে নেমে দাঁড়াতেই হযরত আবুযর (রাদি আল্লাহ আনহু) এসে আমাকে বললেন- ভিতরে চল, তোমাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ডাকছেন। আমি ওনার সাথে হুযূরের সমীপে হাজির হলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখে ফরমালেন, কি খবর, ভাই? যে তোমার উট গুলো তোমার ঘরে পৌছিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিল, সে কি তোমাকে কিছু বলেছে? শুন, সে তোমার উট গুলো সহীহ সালামতে তোমার ঘরে পৌছিয়ে দিয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন- ১৮৫ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানমান ও রেসালতের ঢংকা সব জায়গায় ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। দুনিয়ার যে কোন প্রান্তরের খবর তাঁর জানা হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৬৪৬

বিছিন্নদের পুনমিলন

বনি ইসরাইলের এক নেককার ব্যক্তি তাঁর মৃত্যু সায়াহ্নে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ডেকে অসিয়ত করলেন- 'বাবা, আমার উপর পরের কোন হক থাকলে আদায় করে দিও।' বণি ইসরাইলের লোকেরা যখন এটা শুনলো, ওনার মৃত্যুর পর এক একজন এসে বলতে লাগলো তোমার বাবার কাছে আমার এত টাকা প্রাপ্য ছিল। সে প্রত্যেকের দাবী মুতাবিক কর্জ পরিশোধ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বেচারা একেবারে কপর্দকহীন হয়ে গেল। যখন দেয়ার মত আর কিছু রইলো না, অগত্যা স্বীয় স্ত্রী ও দু'ছেলেকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল এবং সমূদ্রের পাড়ে এসে একটি নৌকায় আরোহন করলো। খোদার লীলা! মাঝ সমূদ্রে নৌকা ভেঙ্গে

গেল। প্রত্যেকে এক একটি কাঠ ধরে ভাসতে লাগলো এবং ভাসতে ভাসতে এক এক জন এক এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। গৃহকর্তা যিনি দাবীদারদের অত্যাচারে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন তিনি জনমানবহীন এক দ্বীপের কিনারায় পৌঁছলেন। কূলে উঠে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজটি শুনতে পেলেন- হে মা বাপের সাথে সদাচরনকারী! সব কিছু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় হয়। এখানে তোমার জন্য একটি গুপ্তধন সংরক্ষিত আছে। অমুক জায়গায় গিয়ে সে গুপ্তধন বের করে ভোগ কর। তিনি যথাস্থানে গেলেন এবং ঠিকই গুপ্তধন পেয়ে গেলেন। আল্লাহর হুকুমে কিছু লোকও অজানা স্থান থেকে ওখানে এসে গেল। তিনি ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর এ সদাচরন, মেহমান নওয়াজী ও দান খয়রাতের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো. আশপাশ ও দূর দরাজ থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগলো এবং যারা আসলো তারা কেউ ফিরে গেল না। ওখানে বসতি স্থাপন করলো। এ ভাবে অল্প দিনের মধ্যে সেই নির্জন দ্বীপ এক বিরাট কোলাহলময় শহরে পরিনত হয়ে গেল। তিনি সেই শহরের কর্ণধার হয়ে গেলেন। লোক মুখে সেই দ্বীপের শাসন কর্তার প্রশংসা শুনে একদিন তাঁর বড় ছেলেও অনেক পথ ঘাট অতিক্রম করে সেই দ্বীপে এসে পৌঁছলো। এবং সোজা শাসনকর্তার সাথে দেখা করলো। শাসনকর্তা ওর সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করলেন এবং এক অজানা আকর্ষনে ওকে তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন। কিন্তু বাপ বেটা কেউ জানতো না যে তারা একে অপরের একান্ত আপনজন। অপর ছেলেটিও খবর পেয়ে সেই দ্বীপে ছুটে আসলো এবং বড় ভাই এর মত সেও দ্বীপের শাসকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো। দ্বীপের শাসক তাকেও এক অজানা আকর্ষনে তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন। তখনও কেউ জানতো না একে অপরের আসল পরিচয়।

এবার ওনার স্ত্রীর কথা শুনুন। সেও একটি কাঠের আশ্রয়ে ভাসতে ভাসতে অন্য একটি দ্বীপে পৌঁছলো। দ্বীপের এক বাসিন্দা ওকে খুঁজে পেয়ে নিজের ঘরে তুলে নিল এবং ওকে বিবাহ করলো। সেই লোকটিও যখন সেই শাসকের বদান্যতার কথা জানতে পারলো, সে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে একটি নৌকা যোগে সেই দ্বীপে আসলো। স্ত্রীকে নৌকায় রেখে সে কিছু উপঢৌকন নিয়ে দ্বীপের শাসকের কাছে গেল। শাসক ওর যথাযত মেহমানদারী করলেন এবং রাত্রে

সেখানে থাকার জন্য বললেন। লোকটি বললো আমার স্ত্রীকে একাকী নৌকায় রেখে এসেছি। দ্বীপের শাসক বললো- কোন চিন্তা নেই। আমি ওর নিরাপত্তার জন্য আমার দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর সেই দু'ভাইকে নৌকায় পাঠিয়ে দিলেন। তারা নৌকার কাছে গিয়ে অবস্থান নিল এবং সারারাত্রি জেগে অতিবাহিত করার জন্য একে অপরের কাছে বিগত দিনের নিজ নিজ ঘটনাবলী বর্ণনা করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর একজন বললো আমার বিগত জীবনের ঘটনা খুবই করুণ। আমরা দু'ভাই ছিলাম। তোমার যে নাম, আমার ভাই এর নামটাও ছিল সেটা। আমার আব্বা, আমার মা ও আমরা দুভাইকে নিয়ে নৌকা যোগে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় হঠাৎ মাঝ সমুদ্রে নৌকাটি ভেঙ্গে যায় এবং আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি ভাঙ্গা নৌকার এক টুকরা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে পৌছি। অন্যদের কোন খবর নেই। আল্লাহ্ জানেন কে কোথায় আছে। অপর জন এ কাহিনী শুনে জিজ্ঞেস করলো- তোমার বাপের নাম কি? সে বললো অমুক নাম। মায়ের নাম জিজ্ঞেস করলে সে বললো অমুক নাম। এটা শুনে সে ব্যাকুল হয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো- খোদার কসম, তুমি আমার আপন ভাই। নৌকায় বসে মহিলাটি ওদের 'মা' নিরবে ওদের কথা শুনছিল এবং অজোরে কাঁদছিল। সকাল বেলা লোকটি এসে ওর স্ত্রীকে ক্রন্দনরত দেখে সন্দেহ করলো যে নিশ্চয় পাহারায় নিয়োজিত যুবকদ্বয় ওর স্ত্রীর সাথে অসদাচরন করেছে। সে খুবই রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে সোজা শাসকের কাছে গিয়ে যুবকদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। দ্বীপের শাসক সাথে সাথে যুবকদ্বয়কে তলব করলেন এবং লোকটির স্ত্রীকেও দরবারে আনালেন। অতঃপর মহিলাকে বললেন- ওদের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ নিঃসংকোচে বল। আমি যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবো। মহিলা বললো- ওদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে রাত্রিকালীন ওদের কথাবার্তা শুনে আমি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। দ্বীপের শাসক রাগত স্বরে যুবকদ্বয়কে ধমক দিয়ে বললো- তোমরা মহিলার মনে আঘাত পাওয়ার মত এমন কি কথা বলেছ? তারা করজোরে বললো- আমরা মহিলাটির ব্যাপারে কোন কথা বলিনি। আমরা শুধু আমাদের বিগত দিনের ঘটনা আলোচনা করেছি। কি আলোচনা করেছিল সেটা শাসক শুনতে চাইলে তারা সেটা শাসককে শুনালো। শাসক তাদের কথা শুনে অস্তির হয়ে নিজ আসন থেকে নেমে ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন-

انتـمـا واللّٰه ولدى। খোদার কসম, তোমরা আমার সন্তান। এ দিকে মহিলাটিও অস্থির হয়ে বলে উঠলো- انا واللّٰه امـهـما। খোদার কসম, আমি ওদের মা। আল্লাহ চাইলে এ ভাবে বিচ্ছিন্নের পুনঃমিলন ঘটাতে পারেন। (নুজহাতুল মাজালিস- ২৮২পৃঃ)

সবক ঃ দুঃখের পর সুখ মিলে। দুঃখের সময় সবরকারীগণ বড় সুফল পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বড় হেকমত ও কুদরতের অধিকারী। তাঁর কাছে অসাধ্য বলতে কিছু নেই। তিনি সর্ব শক্তির অধিকারী।

কাহিনী নং- ৬৪৭

বুজুর্গ মহিলা

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি একবার বায়তুল মুকাদ্দস যেতে বের হলাম। কিন্তু রাস্তা ভুলে গেলাম। হঠাৎ এক মহিলা দৃষ্টি গোচর হলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- ওহে মুসাফির আপনিও কি রাস্তা হারিয়ে ফেলছেন? সে রাগান্বিত হয়ে বললো- আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পর্ন বান্দা কি মুসাফির হয়? আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী কি পথ হারাতে পারে? কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বললো- আমার লাঠির মাথাটা ধর এবং আমার আগে আগে চল। আমি তাই করলাম। কিছুদুর যেতে না যেতে বায়তুল মুকাদ্দসের সুউচ্চ মিনার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি আশ্চর্য হয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম- ব্যাপার কি? আমরা এত তাড়াতাড়ি কি করে বায়তুল মুকাদ্দস পৌছে গেলাম? মহিলা বলরো- 'হে ভদ্র লোক! আপনার চলন ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের মত আর আমার চলন আধ্যাত্মিক মনীষীদের মত। ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি হচ্ছেন স্থলপথে ভ্রমনকারী আর আধ্যাত্মিক মনীষী হচ্ছেন আকাশ পথে ভ্রমনকারী। তাই কোথায় স্থলগামী আর কোথায় আকাশগামী। এতটুকু বলার পর মহিলা আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। (নুজহাতুল মাজালিস ২৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মারেফতের বদৌলতে অনেক বড় বড় মুশকিল সমূহ আসান হয়ে যায়। আরেফ বিল্লাহগন মানুষকে নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। তাঁরা অনেক অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করতে পারেন।

কাহিনী নং- ৬৪৮

অযোগ্য ব্যক্তি

হযরত জুন নূন মিসরী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) এর কাছে এক ব্যক্তি ইসমে আযম শিখতে এসেছিল। লাগাতার কয়েক মাস তাঁর খেদমতে নিয়োজিত রইলো। অতঃপর এক দিন একান্ত কাকুতি মিনতি করে ইসমে আযম শিখিয়ে দেয়ার জন্য হযরত জুন নূন মিসরীর কাছে আর্জি পেশ করলো। তিনি কাপড়ে ডাকা একটি বরতন ওর হাতে দিয়ে বললেন, এটা অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও। সে সেটা নিয়ে যাবার পথে কোন একটা কিছু চিন্তা করে বরতনের মুখটা একটু খুললো। মুখ খোলা মাত্র বরতন থেকে একটি ইদুর লাফিয়ে বের হয়ে গেল। লোকটি এ দৃশ্য দেখে রাগান্বিত হয়ে ওখান থেকে সোজা ফিরে এসে হযরত জুন নুন মিসরীর কাছে গিয়ে বললো আপনি কি আমার সাথে রসিকতা করলেন? হযরত জুন নূন মিসরী বললেন, রসিকতার তো কিছু নেই। আমি একটি ইদুর দ্বারা তোমার আমানতদারী ও উপযুক্ততা যাচাই করে দেখলাম। এতে তুমি নিজেকে সেটার আমানতদার ও উপযুক্ত প্রমান করতে পারলে না। তুমিই বল, যেখানে তুমি একটি মামুলি জিনিসের হেফাজত করতে পার না, সেখানে ইসমে আযমের মত একটি অতি মহৎ বিষয়ের আমানতদারী কি করে রক্ষা করবে? যাও, তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য। (নুজহাতুল মাজালিস পৃ ঃ ২৯ জি ঃ২)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দান করেন না।

কাহিনী নং- ৬৪৯

সাক্ষী

হযরত সুফিয়ান সূরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ছাত্র জীবনে যেখানে লেখাপড়া করতেন, সেখানকার একটি ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিতেন। এক দিন সে ঘরে চোর ঢুকে সব মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। ঘরের মালিক সুফিয়ান সূরীকে এ চুরির জন্য অভিযুক্ত করে ওনাকে পাকড়াও করলো। হযরত সুফিয়ান সূরী এ অসহায় অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন-

হে আল্লাহ! তুমি ইরশাদ করেছ- لايابى الشهداء اذا ما دعوا (যখন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন সাক্ষ্য দিতে যেন অস্বীকার না করে)। এখানে তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন সাক্ষী নেই। হঠাৎ সে সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে চিৎকার দিয়ে বললো- সুফিয়ানকে ছেড়ে দিন। সে চুরি করেনি। চুরি করেছি আমি। লোকেরা ওর কাছে এ অপরাধ স্বীকারের রহস্য জানতে চাইলে সে বললো- আমি নিজের কানে শুনেছি, কে যেন অদৃশ্য থেকে ভীষন রাগত স্বরে বলছে- 'চুরির মালামাল ফিরিয়ে দাও। অতি সত্তর সুফিয়ান সূরীকে মুক্ত কর। অন্যথায় এক্ষনি তোমার সর্বনাশ করা হবে'। (নুজহাতুল মাজালিস- ৩০পৃঃ ২জিঃ)

সবক ঃ খালেস অন্তরে আল্লাহর কাছে যে দুআ প্রার্থনা করা হয়, সেটা নিশ্চয় কবুল হয়।

কাহিনী নং- ৬৫০

মেহনতের ফল

এক বাদশাহ্ কোন এক জায়গায় যাবার পথে দেখলেন যে এক বৃদ্ধ কৃষক একটি বাগানে বৃক্ষরাজির পরিচর্যা করছে এবং অকেজো ডালপালা কেটে সেটে দিচ্ছে। বাদশা ওর কাছে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, বুড়া মিয়া, আপনি কি এ বৃক্ষরাজির ফল খাওয়ার আশা রাখেন? বুড়া বললো- বাদশাহ মহারাজ! আমাদের পূর্বপুরুষগন যে সব বৃক্ষরাজি বপন করে গেছে, সেটার ফল আমরা ভোগ করছি আর আমরা যা করছি, এর ফল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগ করবে। বাদশাহ বৃদ্ধের এ রসিকতা ও তাৎপর্য পূর্ণ কথা শুনে খুবই খুশী হয়ে বৃদ্ধকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশীশ দিলেন। এ বখশীশ পেয়ে বৃদ্ধ হা হা করে হেসে উঠলো। বাদশাহ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এতে হাসির কি আছে? বৃদ্ধ বললো, জাঁহাপনা, আমার বৃক্ষরাজি এত তাড়াতাড়ি ফল দেয়ায় আমি আশ্চর্য হয়ে আনন্দে অট্টহাসি দিয়েছি। বাদশাহ এ জবাবে আরও সন্তুষ্ট হয়ে আরও এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বখশীশ দিলেন। বৃদ্ধ কৃষক পুনরায় হেসে দিল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, এবার কেন হাসলে? বৃদ্ধ কৃষক বললো- কৃষকেরা সারা বছরে মাত্র একবার ফসল পেয়ে থাকে কিন্তু আমার এ ক্ষেত অল্প সময়ের মধ্যে দু'বার ফসল দান করলো। বাদশাহ ওকে

আরও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। (নুজহাতুল মাজালিস- ২৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ মেহনতের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলতে জানলে, জীবনে সফলতা আসে।

কাহিনী নং- ৬৫১

শয়তান

হযরত জাকেরীয়া আলাইহিস সালামের সাহেবজাদা হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম কোন এক জংগলে শয়তানকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কাঁদছ কেন? শয়তান বললো- হে আল্লাহর নবী! যার দীর্ঘ দিনের বন্দেগী ও ইবাদত বিফল হয়ে গেল, সে কাঁদবে নাতো আর কে কাঁদবে? হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহর কাছে আরয করলেন- হে আল্লাহ! এ মলাউন স্বীয় আহমিকার জন্য অনুশোচনা করছে এবং কাঁদতেছে। ওকে কি কোন উপায়ে ক্ষমা করা যায় না? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হে ইয়াহিয়া! এ মলাউনের কান্নার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না। সে আন্তরিকতার সাথে কাঁদছেনা। এ সব তার ভণ্ডামী ও ধোকাবাজি। তুমি তার এ ভণ্ডামী সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলে এক কাজ করতে পার। ওকে গিয়ে বল- আল্লাহ তাআলা বলছেন, তুমি যদি আজও আদম আলাইহিস সালামের কবরকে সিজদা কর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম শয়তানকে যখন এ কথা বললেন, তখন শয়তান হা হা করে হেসে উঠলো এবং বললো, আমি যখন আদমকে তার জীবদ্দশায় সিজদা করলাম না, এখন ওর মৃত্যুর পর কবরকে কেন সিজদা করতে যাব? (নুজহাতুল মাজালিস- ৬০ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ শয়তান মানুষের বড় দুশমন। সে কখনো মানুষের কাছে নত হতে রাজি নয়। ওর মায়া কান্নার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে নেই। সদা ওর থেকে সজাগ থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৬৫২

মৃত্যু ভয়

সলমান বিন আবদুল মালিক একবার হযরত আবু হাসেম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে আরয করলেন- হুযূর, আমরা মৃত্যুকে কেন ভয় করি? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা দুনিয়াকে আবাদ করেছ এবং পরকালকে বরবাদ করেছ। তাই আবাদী থেকে অনাবাদীর দিকে যেতে যে কেউ ভয় পায়। সলমান পুনরায় আরয করলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কোন্ অবস্থায় হাজির করা হবে? তিনি বললেন- নেককার ব্যক্তি এমন ভাবে হাজির হবে যেমন হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ঘরে ফিরে আসে এবং ঘরের সবাই আনন্দ বোধ করে আর বদকার ব্যক্তি এমন ভাবে হাজির হবে, যেমন পলাতক গোলামকে ধরে মুনিবের সামনে হাজির করা হয় এবং সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। (রউজুল ফায়েক ১৩ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের উচিত পরকালকে আবাদ করা যেন হাসি খুশী মনে মৃত্যু বরন করতে পারি।

কাহিনী নং- ৬৫৩

সঠিক হিসাব

এক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে একবার স্বীয় গুনাহ সমূহের ভাবনা জাগলো, সে হিসেব করে দেখলো যে তার বয়স হয়েছে ষাট বছর এবং ৬০ কে ৩৬৬ দিয়ে গুন করে দেখলো যে ষাট বছরে হয় সাড়ে একুশ হাজার দিন। এ হিসেব দেখে সে অবাক হয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। যখন হুঁশ ফিরে আসলো, সে হা হুতাশ করে বললো আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। প্রতি দিন যদি একটি গুনাহও করি, তাহলে সাড়ে একুশ হাজার গুনাহ হয়। কিন্তু আমি তো দিনে একাধিক গুনাহ করেছি। এটা বলে সে পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল এবং মারা গেল। (রউজুল ফায়েক- ১৪ পৃঃ)

সবক ঃ কাল কিয়ামতে প্রত্যেককে আল্লাহর সমীপে হাজির হতে হবে। তাই গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং- ৬৫৪

আবাসিক এলাকা

এক অশ্বারোহী জনবসতিহীন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো- ভাই, এখান থেকে আবাসিক এলাকা কত দূর? লোকটি বললো- ডান দিকে থাকাও। ঐ যে আবাসিক এলাকা দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহী ডান দিকে ফিরে দেখলো যে অদূরে এক বিরাট কবরস্থান ছাড়া কাছে কোন জনবসতি নেই। অশ্বারোহী মনে মনে চিন্তা করলো- লোকটি হয়তো পাগল অথবা মজজুব। সে পুনরায় লোকটিকে বললো- ভাই, আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম আবাসিক এলাকার কথা আর আপনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন একটি কবরস্থান। এর হেতু কি? লোকটি বললো আমি এখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে আসতে দেখেছি কিন্তু কাউকে এখান থেকে চলে যেতে দেখিনি। আবাসিক এলাকাতো এ ধরনের জায়গাকেই বলা হয়, যেখানে দূরদরাজ থেকে লোক জন এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। আমার দৃষ্টিতে সঠিক অর্থে কবরস্থানই আসল আবাসিক এলাকা। (রউজুল ফায়েক- ১৭ পৃঃ)

সবক ঃ পার্থিব জীবনটা হলো ক্ষনস্থায়ী। তাই এটা আমাদের আসল আবাসিক স্থান নয়। আমাদের আসল আবাসিক স্থান হলো কবরস্থান।

কাহিনী নং- ৬৫৫

চার বুজুর্গ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের বৈঠকে গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা আল্লাহর মকবুল বান্দাদের আলোচনা করছেন। সেই বৈঠকে হযরত সরী সকতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- আমি এক দিন বায়তুল মুকাদ্দসে অবস্থান করছিলাম। তখন হজ্বের মাত্র কয়েক দিন বাকী ছিল। আমি সে বছর হজ্বে যেতে না পারায় খুবই মর্মাহত ছিলাম। সেখানে বসে আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, লোকেরা মক্কা মুয়াজ্জমায় ও মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছে গেছে আর আমি এখানে পড়ে রয়েছি। আফসোস! আমি এবার হজ্ব থেকে বঞ্চিত হলাম। এ সব চিন্তা করে আমি অজোরে কাঁদতে

লাগলাম। হঠাৎ আমি অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজটি শুনতে পেলাম- হে সরী কেঁদো না। আল্লাহ্ তাআলা যে কোন উপায়ে তোমাকে হজ্বের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছিয়ে দেবেন। আমি মনে মনে বললাম, এটা কী করে সম্ভব, এখান থেকে তো মক্কা মুয়াজ্জমা অনেক দূর। পুনরায় আওয়াজ আসলো আল্লাহর পক্ষে সব কিছু সম্ভব। এ আওয়াজ শুনে আমি সিজদায়ে শোকর আদায় করলাম এবং অদৃশ্য আওয়াজের সত্যতা প্রকাশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পর বায়তুল মুকাদ্দসের সামনে সুন্দর ও নুরানী চেহারার অধিকারী চার ব্যক্তিকে দেখলাম যাদের নূরানী চেহারা উজ্বল সূর্যের মত চমকাচ্ছিল। এ চার জনের মধ্যে একজন সামনে এবং অপর তিনজন ওনার পিছে পিছে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করার সাথে সাথে পুরা মসজিদ ঝকমক করে উঠলো। আমি তাঁদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম। তাঁরা জামাত সহকারে দু'রাকাত নামায পড়লেন। ইমামতি তিনিই করলেন, যিনি ওনাদের মান্যবর ছিলেন। নামাযের পর ইমাম সাহেব মুনাজাত করতে লাগলেন এবং অপর তিন জন আমীন আমীন বলতে লাগলেন। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম একান্ত ভাবাবেগের সাথে মুনাজাত করা হচ্ছে। যখন তাঁরা মুনাজাত শেষ করলেন, আমি 'তাঁদেরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললাম। তাঁরা সালামের জবাব দিলেন। তাঁদের সেই মুরব্বী আমাকে বললেন, হে সরী, তোমাকে মুবারকবাদ, মনে হয় তুমি অদৃশ্য আহবানকারী থেকে হজ্বের সুসংবাদ পেয়েছ। আমি বললাম, জ্বী হুযূর, আপনি এখানে আসার একটু আগে আমি এ সুসংবাদ পেয়েছি। তিনি বললেন, হ্যা, তোমাকে অদৃশ্য আহবানকারী যখন এ সুসংবাদ দিচ্ছিল, তখন আমি খোরাসানে ছিলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে আরয করলাম, হুযূর এখান থেকেতো খোরাসান এক বছরের পথ। আপনি এত অল্প সময়ে এখানে কি করে পৌঁছে গেলেন? তিনি বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? হাজার বছরের দূরত্ব হলেও সেটা কিছুই না। এ পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহর। আমরা হলাম তাঁর বান্দা। আমরা তাঁর ঘর যেয়ারত করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমাদেরকে পৌঁছে দেয়া তারই কাজ। দেখ, সূর্য পূর্ব থেকে যাত্রা করে একদিনের মধ্যে পশ্চিমে পৌঁছে যায়। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব কত বেশী। সূর্যের মত একটি জড়পদার্থ যদি একদিনে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে, তাহলে আল্লাহর মকবুল বান্দাগন কয়েক সেকেন্ডে এক বছরের পথ অতিক্রম করলে আশ্চর্যের কি আছে? অতঃপর তিনি মসজিদ থেকে

বের হলেন। আমাকেও সাথে নিলেন। যোহরের সময় আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে পানির কোন নাম নিশানা ছিল না। কিন্তু সেই মকবুল বান্দার বরকত ও কারামতে আমরা যেখানে শীতল পানির একটি ঝর্ণা পেলাম। আমরা সেটাতে অযু করে সেখানে যোহরের নামায আদায় করে পুনরায় যাত্রা দিলাম। আসরের সময় হেজাজের দৃশ্যাবলি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এবং মাগরিবের আগেই আমরা মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে গেলাম। মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছার পর সেই মকবুল বান্দা আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (রাউজুল ফায়েক-২২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ আল্লাহ্ তাআলা থেকে বড় বড় ক্ষমতা লাভ করে থাকেন। তাঁরা হাজার হাজার মাইল মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারেন। তাঁদের উসীলায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনেক বান্দাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

কাহিনী নং- ৬৫৬

সাহেবে মাযারের মেহমানদারী

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- একবার আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত শাহ আবদুর রহীম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর কয়েকজন মুরিদসহ দিল্লীর অদূরে দাসনদ গ্রামে যান। সেখানে শাহ মাখদুম শেখ আল্লাহদিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) নামে এক ওলীর মাযার আছে। আমার আব্বাজান তাঁর সাথীরাসহ সে মাযারে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করেন। তখন রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁদের ক্ষুধাও লেগেছিল। তাই তাঁরা ফাতেহা-জিয়ারত থেকে ফারেগ হয়ে তাড়াতাড়ি দিল্লী ফেরার মনস্থ করলেন। এহেন মুহূর্তে মাযার থেকে আওয়াজ আসলো- আবদুর রহীম! খাবারের সময় হয়েছে; একটু অপেক্ষা কর; খাবার খেয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ! শাহ আবদুর রহীম ও তাঁর মুরিদগণ মাযারে বসে রইলেন। তাঁরা এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোন দিকে খাবার আয়োজন দেখতে পেলেন না। মাযারের আশে পাশে কোন লঙ্গরখানাও নাই এবং কোন খাবার হোটেলও নাই। রাত আরও কিছুক্ষণ হলে, অন্যান্য জিয়ারতকারীরা সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।একমাত্র শাহ সাহেব ও তাঁর মুরিদগণ মাযারে বসে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও খাবারের কোন এন্তেজাম না

দেখে শাহ সাহেবের মুরিদগণ অস্থির হয়ে উঠলেন। একটু পর দেখা গেল এক বয়স্কা মহিলা খাবার নিয়ে আসলো এবং তাঁদের সামনে রাখলো। খাবারটা ছিল চাউলের পোলাও, মুরগীর মাংস ও মিষ্টি। তাঁরা তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহন করার পর সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন- এ মুহূর্তে তুমি খাবার কোত্থেকে আনলে? মহিলাটি উত্তরে বললো- আমার স্বামী কার্যাপোলক্ষে বাইরে গিয়েছিলেন যথাসময়ে ফিরে না আসায় আমি মানত করেছিলাম যে আমার স্বামী সহীহ সালামতে ঘরে ফিরে আসলে আমার পালিত মোরগটি জবেহ করে কোর্মা-পোলাও তৈরী করে হযরত মখদুম শাহ আল্লাহদিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মাযারে নিয়ে যাব এবং সেখানে অবস্থানরত দরবেশদেরকে খাওয়াবো। আজই আমার স্বামী কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে। তাই আমি তাড়াহুড়া করে খাবার তৈরী করে আমার মানত পুরণ করার জন্য নিয়ে এসেছি। (আনফাসুল আরেফীন- ৪৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর ওলীগন ইন্তেকালের পরও মানুষের কল্যান করতে পারেন। খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁরা মানুষের হাজত পূর্ণ করতে পারেন। তাঁদের উসীলায় দোয়া প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।

কাহিনী নং- ৬৫৭
পীরের মাযারে ধর্না ও হাজত পূর্ণ

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব বর্ণনা করেন- একবার আমার মুরশেদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর মুরশেদ খাজা নূর মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- যখন আমার মুরশেদ খাজা নুর মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি তাঁর মুরিদদেরকে বলেন- আমাকে আমার জন্মস্থান জুনজানা নিয়ে চলো। তক্ষনি মুরিদগন তাঁকে একটি খাটিয়াতে শোয়ায়ে জুনজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা দিলেন, মাঝপথে থানাভুনে যাত্রা বিরতি করলেন। একটি মসজিদের পাশে খাটিয়া রাখা হলো। এ খবর পেয়ে অনতিবিলম্বে আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। আমাকে তিনি বললেন- এমদাদুল্লাহ, তুমি হলে একা আর হাফেজ জামিল ও মওলভী শেখ মুহাম্মদ হচ্ছে সন্তানাদির অধিকারী। আমার ইচ্ছে ছিল তোমার থেকে মুজাহেদা ও রিয়াযতের খেদমত আদায় করবো। কিন্তু আল্লাহর মর্জি, সে

সুযোগ পেলাম না। জিন্দেগী অফাদারী করলো না। আমার মুরশেদের মুখে এ কথা শুনে আমি খাটিয়া ধরে কাঁদতে লাগলাম। হযরত আমাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, এমদাদুল্লাহ! পীর-ফকীর মরে না। কেবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান্তারিত হয়। এমদাদুল্লাহ! তোমরা ফকীরের কবর থেকে সেই ফায়দা লাভ করে থাকবে, যা যাহেরী জিন্দেগীতে আমার থেকে লাভ করতে। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, বাস্তবিকই তাঁর ইন্তেকালের পর আমি তাঁর কবর থেকে সেই ফায়দা লাভ করেছি, যা তাঁর জীবিতাবস্থায় লাভ করতাম। আমি শুধু একাই হযরত পীর-মুরশেদের কবর থেকে ফায়দা লাভ করতাম না, বরং হযরতের সকল মুরিদই ফায়দা লাভ করতো।

এ প্রসঙ্গ হাজী এবদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী একটি ঘটনা বলেন- আমার পীর ও মুরশেদ খাজা নুর মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর আধা-পাগলা এক মুরিদ ছিল। এক দিন সেই পাগলা পীরের মাযারে এসে আরয করলো- হে মুরশিদ, আমি আর্থিক অভাবে খুবই কষ্টে আছি; এমন কি এক বেলার দুটি রুটিও যোগাড় করতে পারছি না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। যখন সেই পাগলা মুরিদ পীরের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এ আবেদন করলো, তখন খাজা নুর মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কবর থেকে আওয়াজ আসলো- হে আমার মুরিদ, নিরাশ হয়ো না; তুমি প্রতি দিন আমার মাযারে আসা-যাওয়া কর; প্রতি দিন তুমি আমার মাযার থেকে দুআনা বা আধ আনা পেয়ে যাবে। এ আওয়াজ শুনে সে খুবই আনন্দিত হলো এবং প্রতি দিন স্বীয় মুরশেদ খাজা নুর মুহাম্মদ চিশতীর মাযারে আসা যাওয়া করতে লাগলো এবং প্রতি দিন কবরের পায়ের পাশে গিলাফের নিচ থেকে দুআনা পেয়ে যেত। এতে স্বচ্ছল ভাবে তাঁর ঘরের খরচ চলতো। (উল্লেখ্য যে এটা দুশ বছর আগের কথা, তখন দুআনার অনেক মূল্য ছিল)

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- এক দিন আমি আমার পীর-মুরশেদ খাজা নুর মুহাম্মদ চিশতী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) এর মাযার যিয়ারত করতে গেলে, সেখানে সেই পীর ভাই এর দেখা মিলে। সে আমাকে অকপটে সমস্ত ঘটনা বললো- কি ভাবে মুরশেদের কাছে অভাব অনটনের কথা পেশ করলো, কবর থেকে কি ধরনের শান্তনাদায়ক আওয়াজ আসলো, কি

ভাবে প্রতি দিন দুআনা পেত। এমন কি আমাকে সেই জায়গাটাও দেখালো, যেখান থেকে দুআনা পেত। (এমদাদুল মুশতাক- ১১৩ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন ইন্তেকালের পরও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মানুষের কল্যান করতে পারেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অনুসারীদের মধ্যে যারা পীর আওলীয়ার সাহায্যকে অস্বীকার করে, তারা এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

কাহিনী নং- ৬৫৮

আয়না

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরানী চেহারা মুবারকের উপর আবু জেহেলের দৃষ্টি পড়লে সে বলে উঠলো- বণী হাশেমের মধ্যে সবচে বদচেহারা হচ্ছে তোমার (নাউযুবিল্লাহ)। আমি বুঝতে পারলাম না কেন তোমাকে সেরা সুন্দর বলা হয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন আমি স্বীকার করি, তুমি ঠিকই বলেছ, মিথ্যা বলনি। একই সময় হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরকে দেখে বলে উঠলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আপনার উজ্জল নুরানী চেহারা মুরবারকের সাথে দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের কোন তুলনা করা যায় না। সব কিছু আপনার দৃপ্তিময় চেহারা মুবারকের সামনে নিষ্প্রভ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন. তুমি ঠিকই বলেছ, অতিরঞ্জিত করে কিছু বলোনি। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম সবিনয়ে আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি উভয়ের মন্তব্যকে সঠিক বলেছেন। এটা কি করে হতে পারে? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন-তোমরা নিশ্চয় আয়না দেখেছ। আয়নাতে যে যে রকম, তাকে সে রকম দেখায়। আমিও আয়না বিশেষ। যে যে দৃষ্টিতে দেখে, সে রকম দেখতে পায়। (মসনবী- ৪০ পৃঃ)

সবক ঃ যাদের অন্তর আলোকিত, তাদের দৃষ্টিতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর আর যাদের অন্তর অন্ধকার, তাদের দৃষ্টিতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদের মত মানুষ।

৫ম খণ্ড সমাপ্ত

৬ষ্ঠ খণ্ডের অপেক্ষায় থাকুন।